কথাচিত্রকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়

শতঞ্জীব রাহা

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
সুপ্রকাশের পক্ষে
আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়
দেবীনিবাস
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

মুদ্রক :
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ মে, ১৯৫৯

প্রয়াত পিতৃদেবকে,
যিনি বেদনার সংবহনকে
সংকল্পের দৃঢ়তায়
ও
হৃদয়ের ঔদার্যে
সহ্য করতে শিখিয়েছেন,
তাঁর চরণকমলে

কথামুখ

বক্ষ্যমান গ্রন্থটি যে ক'জন মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পড়বে, তাঁরা এই ভেবে অবাক হবেন যে, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতো একজন লেখককে নিয়ে একটি গ্রন্থ কেন? বিশেষভাবে যখন দীনেন্দ্রকুমার এমন একজন লেখক, যিনি প্রচলিত অর্থে সফল সাহিত্যিক বলতে আমরা যা বুঝি তা নন। সাহিত্যের ইতিহাসের বাজার-চল্‌তি গ্রন্থগুলির অধিকাংশেই তিনি একেবারেই স্থান পান নি, যেখানে পেয়েছেন সেখানেও তাঁর প্রসঙ্গে কয়েক ছত্র-মাত্র ব্যয় করেছেন সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা। সাহিত্যের স্বীকৃতি ও সম্মাননা যাঁর জোটেই নি। সমকালেই যিনি উপেক্ষিত, উত্তরকালে অবজ্ঞাত এবং সাম্প্রতিককালে যিনি প্রায় বিস্মৃত—তাঁর জীবন ও সাহিত্য-সাধনার ইতিবৃত্ত নিয়ে আবার স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ কেন!

যাঁরা বয়স্ক পাঠক তাঁদের কাছে দীনেন্দ্রকুমার রহস্যোপন্যাসের লেখক, অপেক্ষাকৃত মনোযোগী পাঠকের কাছে পল্লীবঙ্গের চিত্রাবলীর রচক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটির বহুবিচিত্র সাহিত্যসম্ভার আর সেগুলির শিল্প-সৌকর্যের সম্বন্ধে আমরা এতকাল খোঁজ নেওয়ার অবকাশ পাই নি প্রয়োজনও বোধ করি নি।

আজ সেই খোঁজ পড়ল।

দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যকর্মের যে দিকটি আমাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, তা' মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি তাঁর আস্থা। রহস্যোপন্যাসই হোক আর পল্লীচিত্রই হোক তাঁর সামাজিক মনটি সব রচনায়ই পাওয়া যাবে। তাঁর মানবিক মূল্যবোধের আর-এক দিকে আছে স্বাভাবিক সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রতি তীব্র আগ্রহ। এই আগ্রহই যাবতীয় অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁকে উদ্যত করে তুলেছে। ফলে দীনেন্দ্রকুমারের কোনো কোনো রচনায় তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, এমন-কি আক্রমণের

রোধ দেখা যায়। লক্ষ্য করলে দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় অনেক স্ব-বিরোধ দেখা যাবে। শুধুমাত্র সাহিত্য করেই জীবিকার্জনের দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন বলে অনেক অকিঞ্চিৎকর লেখা তাঁকে লিখে যেতে হয়েছে। রচনার সংখ্যা-প্রাচুর্যের ভিড়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত রচনাগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিহ্নিত করাও কঠিন। তাই অত্যন্ত সতর্কভাবে আমাদের দীনেন্দ্রকুমারের রচনাগুলিকে পড়ে যেতে হয়।

আমি কখনই এ দাবি করছি না যে, এই গ্রন্থটি দীনেন্দ্রকুমারের জীবন ও সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। আমি শুধু খুঁজেছি, সেই খোঁজের একটু পরিচয় বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে পাঠকেরা পাবেন বলে আশা করি। আমি জানি, তন্নিষ্ঠ পাঠকের প্রত্যাশার সীমা এ-গ্রন্থ স্পর্শ না-ও করতে পারে। কেননা, এ-কাজ একার নয়—অর্থ ও সামর্থ্যের সামাজিক সমর্থন এ-ধরনের কাজে একান্ত জরুরি। কিন্তু আমরা সকলেই এ ও জানি যে, সে-সহযোগিতার অনাগত বাতাবরণটি আমাদের কাছে স্বপ্নের। যে-স্বপ্ন স্বয়ং দীনেন্দ্র-কুমারও দেখতেন।

সুতরাং যে-টুকু এখানে সম্পন্ন করা গেল, আশা করি, তা দিয়ে শুধুমাত্র রহস্যোপন্যাসের লেখক হিসেবে দীনেন্দ্রকুমারের যে খণ্ডিত পরিচয় আছে আমাদের কাছে, এ-গ্রন্থ তার অপনোদন করতে পারবে, পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারবে বিস্মৃত-প্রায় এক স্রষ্টার অন্তত অবয়বগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। এই কারণেই এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের অংশগুলি রচিত। এগুলিকে গ্রন্থটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণনা করার জন্য পাঠকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শতঞ্জীব রাহা



প্রায়শই দেখা যায় যে, শুধুমাত্র 'ভালো সাহিত্য' হওয়ার জোরেই কোনো সাহিত্য-কীর্তি টিকে যায়, কালের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। মহৎ সৃষ্টি নিজের জোরেই সমকাল ও তদ্‌পরবর্তীকালকেও অতিক্রম করে যায়, নিজের আসন করে নেয় পাকা।—এ হলো সাহিত্যের কালাতিক্রমী শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ কথা—স্বাভাবিক ন্যায়বোধের দৃষ্টিতে একে বলা যায়: 'যা হওয়া উচিত, তাই'।

কিন্তু সব সময় এই সর্বজনমান্য সাধারণ বিচার পদ্ধতিটি ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। এমন দৃষ্টান্তও কম পাওয়া যাবে না—যেখানে শুধুমাত্র অবহেলা, অবজ্ঞা ও অন্যান্য কারণে এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের সমর্থন ও জোর না থাকায় সৃষ্টি ও স্রষ্টা তাব প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তীযুগের উদাসীনতার ফলেও বহুমূল্যবান সৃষ্টি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। বিশেষভাবে আমাদের দেশে, সমাজে, সাহিত্য-সংসারে এ-উদাহরণ অত্যন্ত সুলভ। কেননা, আত্মবিস্মরণের ব্যাপারে জাতিগতভাবেই আমরা প্রবাদপ্রতিম গৌরবের অধিকারী!

গতযুগেব প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়-ধাঁচের ঘটনাটিই ঘটেছে। একদা বহুপ্রসূ এই কথাসাহিত্যিক আজ প্রায় বিস্মৃত। আজকের বয়স্ক পাঠকেরা বড়জোর তাঁকে মনে বেখেছেন রহস্যকাহিনীর প্রণেতা হিসেবে। যাঁরা আবও-একটু মনোযোগী পাঠক তাঁরা নূতন করে প্রকাশনাসূত্রে পল্লীজীবনের সহজ-সরল চিত্রকর হিসেবে তাঁর পরিচয়ের হদিশ রাখেন। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের বহুমুখী সাহিত্যসৃজনের সঙ্গে আজ আর কারোরই কোনো পরিচয় নেই। অথচ তিনি আমাদের তৎকালীন সমাজের, সাহিত্যের, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের, দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সুস্থরুচির সাহিত্য-মনোরঞ্জনের অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। বাঙলা সাময়িকপত্র প্রকাশ ও পরিচালনার সঙ্গেও তাঁর নাম সম্পূর্ণ জড়িত রয়েছে। তাঁর সরস কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে আমাদের মাটি আর মানুষের জীবন্ত অস্তিত্ব। সেসব কথা ভুলে যাওয়ার অর্থ আত্ম-অবমাননা ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!

জন্ম ও পরিবেশ-পরিজন

দীনেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেছিলেন নদীয়া জেলার মেহেরপুরের এক সম্ভ্রান্ত তিলি পরিবারে (এখানে নদীয়া জেলা বলতে স্বাধীনতাপূর্ব অবিভক্ত নদীয়া জেলাকে

বোঝানো হচ্ছে। স্বাধীনতার সময় নদীয়া জেলায় পাঁচটি মহকুমার মধ্যে কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট বাদে অন্য তিনটি মহকুমা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর পূর্ব-পাকিস্তান [অধুনা বাঙলাদেশ]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়), ১১ ভাদ্র ১২৭৬ বঙ্গাব্দ, ইংরাজি ২৭ আগস্ট ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। পিতার নাম ব্রজনাথ রায়। দীনেন্দ্র-কুমারের জন্মের দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার।

মেহেরপুর প্রায় গ্রাম হলেও অবিভক্ত নদীয়া জেলার একেবারে উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত মহকুমা ছিল। মেহেরপুরের উত্তরসীমায় পদ্মানদীর দক্ষিণ তটভূমি পর্যন্ত প্রসারিত সংকীর্ণকায়া জলঙ্গী বা খড়ে নদী মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নদীয়াকে পৃথক করেছে। মেহেরপুরের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ভৈরব নদ।

নদীয়া জেলার প্রাচীন স্থানসমূহের মধ্যে মেহেরপুর অন্যতম। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এর উৎপত্তি কেউ কেউ কল্পনা করলেও, বলা বাহুল্য এই কল্পনার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আবার কেউ কেউ মিহির ও খনার বাসস্থান হিসেবেও মেহেরপুরকে নির্দেশ করে থাকেন। মিহিরের নাম থেকে মিহিরপুর, তার থেকে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি।—এই অনুমানও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। মেহেরপুরের নামোৎপত্তি সম্পর্কে অন্য মতটি এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে মেহের আলী শাহ নামক এক দরবেশ এই শহর পত্তন করেন।—এটিও কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এর প্রাচীনত্বের সাক্ষী-স্বরূপ শহরের চারপাশে ছড়িয়ে আছে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ। ইতিহাসের এই আভাস-ইঙ্গিত দীনেন্দ্রকুমারের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে।

মেহেরপুর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা। পূর্বোক্ত ভৈরব নদ এর পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। স্বাধীনতাপূর্ব মেহেরপুর পঁচিশটি পল্লীতে বিভক্ত ছিল। কথিত আছে : বহুদিন পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোনো নবাবকে দুর্যোগের রাত্রে আশ্রয় ও আতিথ্য দিয়ে রাজু ঘোষানী নামের জনৈকা গোয়ালিনী নবাবের কৃপালাভ ক'রে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তাদের উপাধি হয় গোয়ালা চৌধুরী, পরগণার নাম হয় রাজপুর। বর্গীর হাঙ্গামায় এই পরিবারটি ধ্বংস হয়। দীনেন্দ্র-কুমারের বাল্যকালে গোয়ালা চৌধুরীদের গড়ের ধ্বংসাবশেষ মেহেরপুরে বর্তমান ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত গড়টি তাঁর বাল্যের কৌতূহলের বিষয় ছিল এবং দীনেন্দ্রকুমার অনুজ সুরেন্দ্রকুমার বহু অনুসন্ধানে এই ধ্বংসাবশেষ থেকে দেবনাগরী হরফযুক্ত দুটি ইট আবিষ্কার করেছিলেন।

পরে রাজপুর পরগণার অধিকারী হন স্বনামধন্যা রাণী ভবানী। মেহেরপুরেরও

তিনি অধিশ্বরী হন। দীনেন্দ্রকুমারদের পরিবারেই রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত দান-পত্র ছিল। দীনেন্দ্রকুমার স্বয়ং লিখেছেন :

> "আমার কাকার কাছে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর নাম-সাক্ষরিত একখানি দানপত্র দেখিয়াছিলাম। তাহা হরিদ্রাভ তুলট কাগজে লেখা তাহার মাথার দিকে 'শ্রীরাণী ভবানী' এই স্বাক্ষর ছিল। মোটা মোটা অক্ষর ঃ কতকাল পূর্বের লেখা ; কিন্তু কালা জল্-জল্ করিতেছিল। জানি না, নাটোরের এই সম্পত্তি কতদিন পরে কি উপলক্ষে কাশিমবাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।"[১]

কাশিমবাজার জমিদারীর পরবর্তীপুরুষ রাজা কৃষ্ণনাথ মেহেরপুরকে জেমস্ হিল নামে এক দুর্দান্ত নীলকরকে ইজারা দেন। নীল-আন্দোলনের সময় স্থানীয় জমিদার মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে হিলের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। মুখোপাধ্যায় বংশ দীর্ঘকাল নিজেদের প্রতাপের দ্বারা এই নীলকরকে সংযত রেখেছিলেন। মেহের-পুরের অন্যতম জমিদার মল্লিক বংশও নিজগুণে বিখ্যাত ছিলেন। মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক বংশের সমৃদ্ধির আমলে মেহেরপুরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে নিদারুণ লোকক্ষয় হওয়ায় মেহেরপুর হতশ্রী হয়ে পড়ে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মেহেরপুরকে মহকুমা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে মুখোপাধ্যায় বংশের গৃহবিবাদ, মহামারীর ধাক্কা ইত্যাদি নানা কারণে মেহেরপুর আর তার পূর্ব-গৌরব প্রাপ্ত হয়নি।

সুতরাং দীনেন্দ্রকুমার যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মেহেরপুর প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পূর্বের তুলনায় শ্রীহীন ছিল।

জমিদার পরিবারগুলি ছাড়া অন্য যে-সমস্ত পরিবার মেহেরপুরে সম্ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কায়স্থবংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্যবংশে সরকার ও মজুমদার, ব্রাহ্মণবংশের চক্রবর্তীরা। এছাড়াও মেহেরপুরের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল তিলিকুলে পাল এবং রায় পরিবার। রাণী ভবানীর দান-পত্রসূত্রেই বোঝা যায় যে, এই পরিবারটি মেহেরপুর অঞ্চলের অতি প্রাচীন বাসিন্দা। এই বংশের সন্তোষ রায় পূর্বোক্ত গোয়ালা চৌধুরীদের দেওয়ান ছিলেন বলে জানা যায়। রায় বংশের যদুনাথ রায়ও ছিলেন সবিশেষ প্রসিদ্ধ মানুষ। দীনেন্দ্রকুমারের পিতা ব্রজনাথ রায় মেহেরপুরের সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন, কাজ করতেন কৃষ্ণনগরে জমিদারী সেরেস্তায়। আত্মকথা 'সেকালের স্মৃতি'-তে দীনেন্দ্রকুমার নিজ পিতা এবং রায় পরিবারের কিছু কথা জানিয়ে গিয়েছেন।

শিক্ষা-দীক্ষা রায় পরিবারে যথেষ্টই ছিল। তাঁর দুই কাকা তাঁদের দাদা ব্রজনাথের কাছে কৃষ্ণনগরে থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। ছোটো কাকা হুগলীর নর্মাল স্কুলে পড়তেন। ব্রজনাথ নিজে বাঙলানবীশ চাকুরে ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন:

> "সে সময় মেহেরপুরে তাঁহার মত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কেহ লিখতে পারতেন না।"[২]

চাকুরী-সূত্রে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তিনি সেকালের শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকে উজ্জ্বল কৃষ্ণনাগরিকদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কৃষ্ণনগরের বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। এমন-কি কৃষ্ণনগরে থাকার সময় ব্রজনাথ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি থেকেও বহুলাংশে মুক্ত হয়েছিলেন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের দিকে:

> "তাঁহার যৌবনকালে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এজন্য তিনি ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি আস্থাহীন হইলেও ঘরে বসিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি, তিনি আসনে বসিয়া করজোড়ে 'অলখ নিরঞ্জনের' উপাসনা করিতেন, তাঁহার মুদ্রিত নেত্র হইতে অশ্রুর প্রবাহ বহিত, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহার উপাসনা শেষ হইত না।"[৩]

সেকালে ইংরাজি অর্থকরী বিদ্যা ছিল। কিন্তু ইংরাজি আদৌ না শিখেও শুধুমাত্র বাঙলানবিশীর জোরেই বা সামান্য ইংরাজি শিখে অনেকেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করতেন। বাঙলানবীশেরা নায়েবী বা গোমস্তাগিরি করে জমিদারীর মালিক পর্যন্ত হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও সেকালে কম ছিল না। কিন্তু দীনেন্দ্র-পিতা ব্রজনাথ অর্থোপার্জনে বিশেষ সফল হননি। ফলে সচ্ছল হলেও রায় পরিবার, দীনেন্দ্রকুমার যখন জন্ম নেন তখন, ধনী ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু অর্থশালী ছিলেন না। অন্ন-সংস্থানের জন্য ব্রজনাথ ও তাঁর ভ্রাতাদের চাকুরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। অর্থ-উপার্জনের জন্য কৌশলের অবতারণা করার ব্যাপারে অনীহা ব্রজনাথের ভ্রাতাদের মধ্যেও দেখা যায়। দীনেন্দ্রনাথের এক কাকা যদুনাথ রায় মহিষাদল রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ম্যানেজার হিসেবে দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অধিক পরিমাণে বেতন পেলেও অতিরিক্ত অর্থ-উপার্জনে রীতিমতো বীতস্পৃহ ছিলেন। ফলে এতবড়ো চাকুরি করা সত্ত্বেও তিনি অকালে মারা গেলে সমগ্র রায় পরিবারটিকেই

অন্নাভাবে বিব্রত হতে হয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমারের আর-এক কাকা পেশায় শিক্ষক ছিলেন।

দীনেন্দ্র-পিতা ব্রজনাথ অর্থোপার্জনে সফল না হলেও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগী ছিলেন। প্রথম যৌবনে 'কুসুমকামিনী' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাব্যগ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলে তিনিই মেহেরপুর অঞ্চলের প্রথম গ্রন্থকার-হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

এই সমস্ত পাবিবাবিক গুণাবলীর উত্তরাধিকাবী হয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমার।

বাল্য ও শিক্ষাজীবন

বাল্যকাল ও শৈশবের শিক্ষাজীবন দানেন্দ্রকুমারের পক্ষে ছিল মহামূল্যবান। তিনি ভালোবেসেছিলেন নিজ বাসস্থানকে, ছায়া-সুনিবিড শান্তিব নীড পল্লী-বাংলার সুলভ সুখেব পশরাকে, সহজ আনন্দের আয়োজনকে। জীবন-সায়াহ্নে স্মৃতিচারণ করতে বসে তিনি হারানো পল্লী ও শৈশবের জন্যে যে ভাষায আক্ষেপ প্রকাশ কবেছিলেন, সেটুকু উদ্ধৃত করলেই তাঁব বাল্যকাল মেহেরপুরে কেমনভাবে কেটেছিল তাব একটি স্মৃতি-অবসিত প্রোজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাবে :

> "...অর্দ্ধ শতাব্দী বা তাহারও কিছুকাল পূর্ব্বে সুখশান্তিপূর্ণ, ছায়াশীতল, শ্যামল পল্লীবক্ষে আমাদের শৈশবজীবন কিভাবে অতিবাহিত হইযাছিল, এ দীঘকাল পরে তাহার আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।
>
> অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে পল্লী দেখিযাছিলাম, যে পল্লীতে শান্তিপূর্ণ নিরুদ্বেগ শৈশব, কৈশোরে অতিবাহিত করিয়াছিলাম, গত পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বছরের মধ্যে সেই পল্লীর কি ঘোর পরিবর্ত্তন! ইহা যে আমাদের সেই সুখময শৈশবের পল্লী, এখন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না,...।"[8]

এই নিরুদ্বেগ শৈশবে দীনেন্দ্রকুমার এবং পরিবারস্থ সকলে অভিভাবক ছিলেন পিতামহ। পিতা প্রবাসে থাকায় রায় পরিবারের বালকের দল পিতামহের শাসনে, মোটামুটি আদরে এবং স্নেহচ্ছায়াতেই বেডে উঠেছিল।

দীনেন্দ্রকুমারের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় বাডিতেই, কাকার কাছে। বর্ণবোধ ঘটে যাওয়ার পর 'কথামালা'। কিন্তু 'বাঘ ও বকে'র গল্প পড়ে সময় অতিবাহিত হচ্ছে দেখে ঠাকুরদাদা তাঁকে অধিকারীপাডার শ্রীচরণ অধিকারীর চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম ছিল সীতানাথ অধিকারী। এই গ্রামীণ পাঠশালার যে সরস ও উপভোগ্য বর্ণনা দীনেন্দ্রকুমার

আত্মস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করেছেন তাকে এক কথায় আমরা সেকালের ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ দেশীয় শিক্ষার মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধহীন, স্নেহমমতাহীন, বেত্রমাত্রসম্বল এই শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে 'পথের পাঁচালি'র প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালার মৌল কোনো তফাৎ নেই।

পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে তিনি গ্রামের বাঙলা স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে কিছুদিন পড়বার পরে ভর্তি হলেন মেহেরপুর এনট্রান্স স্কুলে। এই স্কুলেই দীনেন্দ্রকুমারের এক কাকা দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে মেহেরপুরের জনধারার তিন পুরুষকে শিক্ষাদান করেছিলেন।

বেশ কয়েক বছর মেহেরপুর স্কুলের কোনো ছাত্র এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় স্কুলটিকে মধ্য-ইংবাজি বা মাইনর স্কুলের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। দীনেন্দ্রকুমারের কাকাই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেন। কিন্তু পিতা ব্রজনাথ রায় মাইনর স্কুল থেকে ছাড়িয়ে তাঁকে নিজ কর্মক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে নিয়ে এলেন। ফলে তাঁর স্কুল জীবনের কিছু সময় নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরেই অতিবাহিত হয়। বারিদবরণ ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> "মেহেরপুরে জন্ম হলেও পিতার কর্মস্থল এই কৃষ্ণনগরেই তাঁকে পাঠ্য-জীবনে অধিকাংশ অতিবাহিত করতে হয়েছিল।"[৫]

কৃষ্ণনগরে এসে দীনেন্দ্রকুমার কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন : 'বিলের মাছ যেন সাগরে পড়িল।'[৬]

মেহেরপুরে থাকার সময় যেমন সহজ সরল গ্রামীণ পরিবেশে বাল্য কেটেছে, কৃষ্ণনগরে এসে তেমন আলো ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনগরে পড়াশোনার পরিবেশের অবনতি ঘটায় তিনি পুনরায় মেহেরপুরে প্রেরিত হয়ে মাইনর স্কুলেই ভর্তি হলেন। এবং এখান থেকেই দীনেন্দ্রকুমার মধ্য-ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

আমরা আগেই বলেছি যে, মেহেরপুর এনট্রান্স স্কুল পরিণত হয়েছিল মাইনর স্কুলে। ফলে মাইনর পাশ করে তাঁকে এনট্রান্স পড়ার জন্য কৃষ্ণনগরে আসতে হয়। কিন্তু এবারও দীর্ঘকাল তাকে কৃষ্ণনগরে অবস্থান করতে হলো না। ইতিমধ্যে মেহেরপুর স্কুল পুনরায় মাইনর থেকে এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে দীনেন্দ্রকুমার ফিরে যান মেহেরপুরে।

দীনেন্দ্রকুমারের ছাত্রজীবন উল্লেখ করবার মতো উজ্জ্বল নয়। কেউ যদি তাঁর

ছাত্রজীবনে যথোচিত গৌরব খোঁজেন তবে তাঁকে নিশ্চিতভাবেই হতাশ হতে হবে।

১৮৮৭ সালে মেহেরপুর স্কুল থেকে তিনি প্রথমবার এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন এবং অকৃতকার্য হলেন। ইংরেজি সাহিত্যে পাশের নম্বর রাখতে পারলেন না। সে বছর ঐ স্কুল থেকে ছয়জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ছয়জনই অনুত্তীর্ণ হয়েছিলেন ইংরেজিতে। এ বছরটা ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি বছর। জনশ্রুতি আছে একারণে সে বছর পাশের সংখ্যা ও হার ছিল প্রচুর, তবু অকৃতকার্য।

অবশ্য পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর কাকার চাকুরিস্থল মহিষাদলের এনট্রান্স স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। মেহেরপুর থেকে মহিষাদল! মহিষাদল স্কুলটি ছিল স্থানীয় রাজ এস্টেটের অধীন এবং দীনেন্দ্রকুমারের কাকা এস্টেটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে স্কুলের একজন প্রধান মুরুব্বি ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন:

> "মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর পর বৎসর আমরা এনট্রেন্স পরীক্ষার গোষ্পদ পার হইলাম।[৭]

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ: দীনেন্দ্রকুমার পনেরো বছর চার মাস বয়সে মহিষাদল এইচ. ই. স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[৮] প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পড়াশোনার জন্য তিনি আবার কৃষ্ণনগরে এলেন, ভর্তি হলেন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। মাত্র দু'বছর তিনি এই কলেজে পড়েছিলেন। এই সময় পাঠ্যবিষয় অপেক্ষা সাহিত্য রচনায় বেশি মন যাওয়ায় অঙ্ক পরীক্ষায় পাশের নম্বর রাখতে পারলেন না। বিশেষভাবে ত্রিকোণমিতি কনিকসেকশনের সঙ্গে 'আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ' থাকায় অঙ্কশাস্ত্রে সুবিধা করতে পারলেন না। কাকা রাগ করে কলকাতার জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়তে পাঠালেন। কিন্তু কলকাতায় এসে পড়াশোনার সুবিধা বিশেষ হলো না, বরং সাহিত্যালোচনা ও রচনা অনেকগুণ বেড়ে গেল। ফলে তাঁকে কলকাতা ত্যাগ করে কাকার কাছে ফিরে যেতে হলো:

> "তখন মহিষাদলে গিয়া স্কুলের মাষ্টারী কার্যে লিপ্ত থাকিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হইল।"[৯]

ধরা যেতে পারে: দীনেন্দ্রকুমারের প্রথাগত শিক্ষাজীবনের এখানেই সমাপ্তি। মহিষাদলে অবস্থানকালে তিনি এল. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন দু'বার এবং দু'বারই

অকৃতকার্য হয়েছিলেন। বলা যায়, এল. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির কাল থেকেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

কর্মজীবন: সাহিত্যের টান

আমরা দেখলাম যে, মহিষাদল এইচ. ই. স্কুলে শিক্ষকতাকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।

একথা ঠিকই যে, দীনেন্দ্রকুমারের পরিবারের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই ছিল যে, তাঁর চাকুরি করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাকা শুধুমাত্র আর্থিক প্রয়োজনে তাঁকে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করে দেন নি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল: দীনেন্দ্রকুমার এল. এ. পাশ করে মেহেরপুরে গিয়ে আইন-ব্যবসায় নিযুক্ত হোন। কিন্তু তখন প্রাইভেট ছাত্ররূপে এল. এ বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া যেতো না। শুধু-মাত্র শিক্ষকেরাই প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেতেন। সুতরাং এল. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁকে চাকুরি গ্রহণ করতে হলো।

গণিতের ত্রাস এখানেও তাঁর পিছু ছাড়ল না। প্রথমবার এল. এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি অঙ্কে অকৃতকার্য হলেন। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার আগেই তিনি গণিত শিক্ষক-হিসেবে পেলেন পরবর্তীকালের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেনকে (১৩. ৩. ১৮৬০-১৫. ৩. ১৯৩৯)। পেলেন না বলে বলা ভালো: কৌশলে সংগ্রহ করে নিলেন। দীনেন্দ্রকুমারের চেষ্টাতেই জলধর মহিষাদল এইচ. ই. স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দীনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে এক বাসায় থাকতেন। ফলে গণিত শিক্ষা অপেক্ষা সাহিত্যালোচনা ও সাহিত্যচর্চাই বেশি হতে থাকল। এল এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয়বারও তিনি অকৃতকার্য হলেন। এবারও গণিতে! অবশ্য জলধর সেন এবং দীনেন্দ্রকুমার এ-ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। [দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট □ এক]

এবার তাঁর মহিষাদল বাস উঠল। দীনেন্দ্রকুমারের ইচ্ছা ছিল স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার, ইচ্ছা ছিল সাহিত্য-কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ছাপাখানা স্থাপন করবেন। কিন্তু বিনিয়োগ করার মতো পারিবারিক মূলধন বা তাঁর কাকার অতটা আর্থিক সঙ্গতি ছিল না।

চাকুরির চেষ্টায় দীনেন্দ্রকুমার মহিষাদল ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন। ইতঃপূর্বেই লেখালেখির সূত্রে 'ভারতী' পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কলকাতায় এসে ভারতীর কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ির পত্রিকা-অফিসে

বাস করেই তিনি চাকুরির খোঁজখবর করতে লাগলেন। তাঁর কোনো উমেদার ছিলেন না। কিভাবে উমেদার সংগ্রহ করতে হয়, কিংবা কিভাবে উমেদারী করতে হয়—সেসব কৌশল তাঁর জানা ছিল না:

> "কি করিয়া অফিসের কর্তাদের মন ভিজাইতে হয়, সাহেব লোকের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে হয় এবং তৈলদানের প্রকৃষ্ট পন্থা কি, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল।"[১০]

ফলে কলকাতায় চাকুরি হলো না। ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন—রাজসাহীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। লোকেন্দ্রনাথ রাজশাহীর জেলাজজের কাছে দীনেন্দ্রকুমারের নামে এক সুপারিশপত্র লিখে দিলেন।

রাজসাহীতে গিয়ে সেই সুপারিশপত্রের জোরে ভালো কোনো চাকুরি জুটলো না। জেলাজজের অফিসে কোনো চাকুরি খালি না থাকায় দীনেন্দ্রকুমার আদালতের সেরেস্তায় শিক্ষানবীশের কাজে নিযুক্ত হলেন। এটা সম্ভবত ১৮৯৩ সালের ঘটনা।

সাহিত্যসেবী দীনেন্দ্রকুমারের কাছে সেরেস্তার চাকুরিকে 'দিনগত পাপক্ষয়' বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ শুধু একঘেয়েই নয়, বিড়ম্বনারও। এই একঘেয়েমি ও বিড়ম্বনা তাঁকে যথেষ্টই সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু উপকার হয়েছিল এই যে, চাকুরিকালে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছিলেন তিনি।

জজ-আদালতের সামগ্রিক পরিবেশ এবং দেশীয় সিভিলিয়ান, বিশেষভাবে একদা তাঁর চাকুরির সুপারিশকারী লোকেন্দ্রনাথ পালিতের (তখন রাজসাহীর জেলা-জজ) দুর্ব্যবহার দীনেন্দ্রকুমারকে এই চাকুরির ব্যাপারে মোহমুক্ত করে। কিন্তু পারিবারিক বিপর্যয়, পিতা এবং দুই কাকার মৃত্যু তাঁদের পরিবারের আর্থিক বনিয়াদকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ফলে আর্থিক অনিয়ম, অবাধ উৎকোচ এবং খোসামদে আপাদমস্তক নিমজ্জিত এই চাকুরি তাঁকে বাধ্যত করে যেতে হচ্ছিল।

চাকুরি ত্যাগের সুযোগ এলো ১৮৯৮ সাল নাগাদ। তখন অরবিন্দ ঘোষ (১৫. ৮. ১৮৭২—৫. ১২. ১৯৫০) ভারতীয় সিবিল সার্ভিসে (আই. সি. এস.) প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে সিবিল সার্ভিস থেকে বঞ্চিত করেছে। তখন অরবিন্দ তদানীন্তন সুখ্যাত দেশীয় রাজ্য বরোদার

মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড়ের সরকারে চাকুরি গ্রহণ করেন। অরবিন্দ ইংরাজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও আশানুরূপ বাঙলা জানতেন না। বরোদায় তাঁকে বাঙলা ভাষা শেখাবার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল।

দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের বাঙলা-শিক্ষক হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। লেখক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ও সাহিত্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে তিনিই এই কাজের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেন। জানা যায়: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দীনেন্দ্রকুমারের নাম সুপারিশ করেছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শীতকালের শুরুতেই দীনেন্দ্রকুমার বরোদা রওনা হলেন। প্রথমে তিনি জজের অফিস থেকে ছয় মাসের জন্য বিনা বেতনে ছুটি চেয়েছিলেন। দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় রাজসাহী কোর্টের কাজে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

প্রায় দু'বছর দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের বাঙলা-শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে জলধর সেনের আহ্বানে দীনেন্দ্রকুমার বাংলাদেশে ফিরে আসেন, যোগ দেন বসুমতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে। বস্তুত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১০ ভাদ্র তারিখে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রকাশ ঘটে। জলধর সেনের উপর এই পত্রিকার দায়িত্ব বর্তালে জলধরই চিঠি দিয়ে দীনেন্দ্রকুমারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এইবার তাঁর স্থায়ী কর্মজীবন শুরু হয়।

সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে দীনেন্দ্রকুমার দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের শেষভাগে জলধর সেন মাসিক বসুমতী ত্যাগ করলে দীনেন্দ্রকুমার এই পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হন।

বসুমতী পত্রিকার সঙ্গে থাকার সময়েই বসুমতী কার্যালয় থেকে উপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত 'নন্দনকানন' নামক উপন্যাস ও গল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন তিনি। এ-ছাড়াও দীনেন্দ্রকুমার 'তিলি' সমাজ, 'রহস্যলহরী' ইত্যাদিরও সম্পাদনা করেন। জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'র সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

দীনেন্দ্রকুমার তাঁর পাঠ্যজীবন ও কর্মজীবনের প্রথমভাগে যখন যেখানে থেকেছেন সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সাময়িকপত্রের কর্মী হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর জীবনে নেশা ও পেশার যোগ ঘটেছে, সমার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর কর্ম-জীবন ও সাহিত্য-জীবন।

দীনেন্দ্রকুমারের জীবনকথা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমগ্র জীবনই তিনি সাহিত্যসঙ্গ গড়ে তোলার এবং সাহিত্যচর্চার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও নাড়ীর টানই তাঁকে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণে আশানুরূপ সফল হতে দেয় নি, টিকতে দেয় নি নকলনবিশীর কাজে।

সাহিত্যের প্রতি এই আগ্রহ দীনেন্দ্রকুমারের জীবনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। পিতা ব্রজনাথ বিষয়কর্মে ব্যর্থ হলেও, নিজে শুধু কবিই ছিলেন না কৃষ্ণনগরের গুণীজনদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। একটির বেশি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত না হলেও ব্রজনাথ সাহিত্যচর্চা কোনোদিন ছাড়েন নি বলেই মনে হয়। তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'আকিঞ্চনের মনের কথা' সেকালের অনেক ঘটনা ও বহু ব্যক্তির জীবন্ত বিবরণে পরিপূর্ণ ছিল বলে দীনেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন। তিনি পিতার রচনার একটু নমুনাও আমাদের জন্য উদ্ধার করে দিয়েছেন :

১

"আজ সাঙ্গ তব বিদ্যাদান!
আসিছে আঁধার রাতি, নিবেছে প্রাণের বাতি,
এখন তোমার উঠবে কথা নানা জাতি, সেসব মাত্র অনুমান ॥

২

হ'ল জীবনের অবসান।
আর ফিরিবে না তুমি, তব প্রিয় জন্মভূমি,
কে তব সমাধি চুমি গাহিবে খেদের গান ॥

৩

এই ত জীবনের অভিমান!
যার জানছি তোমার পিছে পিছে,
তবু মনের ভ্রম ঘোচেনা;
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ভুলে আছি ভগবান ॥"[১১]

গানটি ব্রজনাথ তাঁর যৌবনকালে কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন সাহেব প্রিন্সিপালের মৃত্যুতে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে শোক-সঙ্গীত হিসেবে রচনা করেছিলেন।

শুধু সাহিত্যসাধক পিতার জন্য নয়, দীনেন্দ্রকুমার যে বাল্যকাল থেকেই নদীয়া জেলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ও গর্বিত ছিলেন সে কথা 'সেকালের স্মৃতি'তে বিস্তারিতভাবে তথ্যসহ উল্লেখ করতে ভোলেন নি তিনি।

কিশোর বয়সে মেহেরপুরে থাকার সময়ে যে মহান মানুষটি দীনেন্দ্রকুমারকে সাহিত্যক্ষেত্রে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁর নাম হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩—১৮৯৬)। পূর্ববঙ্গ ও নদীয়া জেলা-সন্নিহিত অঞ্চলে কাঙাল হরিনাথ নামেই তাঁর পরিচিতি সমধিক। সাহিত্যিক-সাংবাদিক, সাময়িকপত্রের সম্পাদক, সাধক ও বাউলসঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে সমগ্র বাঙলাদেশেই তাঁর পরিচিতি ছিল। হরিনাথ ছিলেন নদীয়া জেলারই কুমারখালির বাসিন্দা। তাঁর সম্পাদনায় কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হতো সেকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'। জমিদার, নীলকর, অত্যাচারী শাসক ও রাজকর্মচারী এবং সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ছিল একটি বিশিষ্ট নাম। হরিনাথের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিজয় বসন্ত' নামের উপন্যাস। 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রায় সমকালে লিখিত 'বিজয়-বসন্ত'কে শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছিলেন।[১১ক] সেকালে বিজয়-বসন্তের প্রচার ছিল গোটা বাংলাদেশেই। হরিনাথের কাঙাল ফিকিরচাঁদ ভণিতাযুক্ত বাউলগান পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আদরের সামগ্রী ছিল। দেহতত্ত্বের গানকে ভদ্রসমাজে তিনিই জনপ্রিয় করেছিলেন। হরিনাথ অসাধারণ জনপ্রিয় লোকশিক্ষক হিসেবে জীবৎকালে পরিচিত ছিলেন। কাঙালের ব্যক্তিত্ব ছিল সম্মোহনী। এই ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি বহু যুবক এবং ভাবীযুগের সাহিত্যিক-সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন নিজের দিকে, দীক্ষা দিয়েছিলেন সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায়। তাঁর সাহিত্য-শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), তন্ত্র-সাধক ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩), সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২২), সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১) প্রমুখ। হরিনাথের ভক্ত-শিষ্যের তালিকায় দীনেন্দ্রকুমার কৈশোরেই নিজ নাম যুক্ত করেছিলেন। উপরোক্ত তালিকার সকলেই নিজেদের সাহিত্য তথা সমগ্র জীবন-সাধনায় হরিনাথের প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। দীনেন্দ্রকুমারও

তার ব্যতিক্রম নন। তিনি কৈশোরে মেহেরপুর থেকে কুমারখালির কাঙাল-কুটিরে ছুটে যেতেন হরিনাথের আকর্ষণে। তাঁর নিজের সাক্ষ্য :

> "বেণুর বিমুগ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় কাঙালের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া কিশোর বয়সে কতবারই তাঁহার নিকটে গিয়াছি।"[১২]

দীনেন্দ্রকুমার হরিনাথের কাছ থেকে সাহিত্য ছাড়াও সাংবাদিকতা এবং সাময়িক পত্র পরিচালনায়ও দীক্ষা পেয়েছিলেন।[১৩]

দীনেন্দ্রকুমারের কর্মজীবন ও শিক্ষাজীবনের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর আগ্রহ আবাল্য। এই আগ্রহ তাঁর কর্মজীবনেও, যখন যেখানে থেকেছেন সেখান পর্যন্ত, প্রসারিত হয়েছে। সাহিত্যমনস্ক ও সাহিত্য-চর্চাকারী মানুষ তিনি সর্বদাই খুঁজে নিয়েছেন। সাহিত্য তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশেছিল।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে, ছাত্রাবস্থাতেই দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় সেকালের বিখ্যাত ও অভিজাত সাহিত্যপত্র ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায়। প্রথম রচনাটির নাম : 'একটি কুসুমের মর্মকথা'। 'প্রবাদ প্রশ্ন' শিরোনামে তখন ভারতীতে বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। ঐ সিরিজে দীনেন্দ্রকুমারের উপরোক্ত রচনাটি প্রকাশিত হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের রচনাকর্ম শুরু হয়েছিল অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিকেরই মতো গদ্য দিয়ে নয়, পদ্য দিয়ে—কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে।

'সেকালের স্মৃতি'তে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন যে, কৃষ্ণনগরে ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন বঙ্গদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণনাগরিক মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয় অতুলচন্দ্র বসু তাঁর সহপাঠী ছিলেন এবং :

> "মি. ঘোষের দুই ভাগিনেয়ী বিনয়কুমারী বসু [জন্ম : ১৮৭২] প্রমীলা বসু [মৃত্যু : ১৩০৩ বঙ্গাব্দ] চমৎকার কবিতা লিখিতেন; তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কোন কোন কবিতা সেকালের মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু আমার কবিতায় ভাব ও দৈন্য বুঝিতে পারিতাম, এজন্য কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিই। তথাপি কবিভগিনীদ্বয় সে সময় কবিতা-রচনায় আমাকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।"[১৪]

তাঁর কাব্যচর্চার নিদর্শন : 'শূন্যগৃহ', 'চিত্র' ইত্যাদি কবিতা। নিতান্ত কৈশোরে,

ছাত্রাবস্থায় তিনি সাময়িকপত্রে রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এই লেখা ও তার প্রকাশ সমগ্র জীবন জুড়ে অব্যাহত ছিল। সেই বিপুল সাহিত্য-সম্ভারের কথায় আমরা পরে আসব। আমাদের এখনকার প্রসঙ্গ : তাঁর সময়ের সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডল এবং সাহিত্যসঙ্গে তাঁর বেড়ে ওঠা।

দীনেন্দ্রকুমার যে-সময় লিখতে শুরু করেন তখন বাঙলাসাহিত্য স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যাঙ্গনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' তখন বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রচার' পত্রিকা (বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত চলেছিল। তারপর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১২৯০-এর কার্তিক থেকে মাঘ এই চারমাস শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন। অনেক পরে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। আর 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে, ১২৯১ বঙ্গাব্দে)। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন 'কৃষ্ণচরিত্র'—গীতার সময়োপযোগী ব্যাখ্যা। বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রচার পত্রিকার সম্পাদক। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত রচনাসমূহ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। প্রকাশিত হয়েছে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস, নাটক এবং কাব্য-কবিতা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) তখন সবে সাহিত্যাঙ্গনে দেখা দিচ্ছেন। তখন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যচর্চার আবহাওয়া জমে উঠেছে, যদিও তা মূলত কলকাতার বুকেই সীমাবদ্ধ। সেকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সুপরিচিত কবি ও লেখক। মহিলা কবিদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩০), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৬৮-১৯২৪) প্রমুখ খ্যাতি পেয়েছেন। —কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) কামিনী সেন নামে প্রকাশ করছেন কুমারী জীবনের কবিতা।

দীনেন্দ্রকুমার যখন কলেজে পড়েন তখন প্রকাশিত হয়ে গেছে অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু একটি কাব্যগ্রন্থ : 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (প্রথম ভাগ : ১৮৬৫, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৭)। ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনামে কাব্যটি রচনা করেছিলেন নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)। কাব্যটি তখনকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন এটি কোনো মহিলা

কবির রচনা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মহিলা নামের অন্তরালে থাকা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১৫] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের তখন মোটামুটি চলন ছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র থাকার সময় স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় দীনেন্দ্রকুমারের কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হতো—সেকথা আগেই জানি। পরে 'সাধনা' (১২৯৮) পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করলে তাতেও দীনেন্দ্রকুমার লিখতে থাকেন।

কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থানকালে এবং কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করার সময় তিনি শহরে ও কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে অল্প-স্বল্প সাহিত্যের আবহাওয়া ও পরিবেশ পেয়ে যান। সেই কৃষ্ণনগর, যেখানে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়—সেই কৃষ্ণনগর, যে-শহর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত—সুগায়ক ও সুলেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের বাসভূমি। কৃষ্ণনগরে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গমনাগমনও সেই সময়বৃত্তে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

কৃষ্ণনগর কলেজে দীনেন্দ্রকুমার সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন জগদানন্দ রায়কে জগদানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হতো যথেষ্টই :

> "আমার সতীর্থগণের মধ্যে রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের [১৮৬৯-১৯৩৩] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; তিনিও সেই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। কলেজের ছুটির পর আমরা উভয়ে একত্রে বাসায় ফিরিতাম। ···তিনি বলিতেন, সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভের তাঁহার আগ্রহ থাকিলেও শক্তি নাই, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।"[১৬]

সাহিত্যালোচনা ও সাহিত্য-সাধনায় দু'বছরের কৃষ্ণনগরের জীবন বেশ আনন্দেই কেটে যায়। এ থেকে প্রথাগত শিক্ষায় কিছু অবহেলা এসে থাকতে পারে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে প্রেরিত হলে সাহিত্য আলোচনা যে বেড়ে গিয়েছিল, তা' আমরা আগেই দেখেছি। কৃষ্ণনগরে থাকতেই 'ভারতী' ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাতেও লিখতেন।

কর্মসূত্রে মহিষাদলে থাকার সময় দীনেন্দ্রকুমার একটু কৌশল করে নিজের

সাহিত্যসঙ্গী সংগ্রহ করে নেন। মহিষাদল স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হয়েছিল। এই পদের জন্য গণিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। দীনেন্দ্রকুমার স্কুলের মুরুব্বি তাঁর কাকাকে বলে জলধর সেনকে ঐ পদে নিয়ে এলেন। ইতিপূর্বে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর জলধর সংসার ত্যাগ করে হিমালয় চলে গিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় লিখতেন, হরিনাথের সাকরেদী করতেন। হিমালয়ে চলে যাওয়ার দীর্ঘকাল পরে জলধর ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে দীনেন্দ্রকুমার তদ্বির করে তাঁকে মহিষাদল এইচ. ই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিয়ে এলেন। দীনেন্দ্রকুমারের কাকাও এই প্রস্তাব মেনে নিলেন, প্রাইভেট স্টুডেন্টরূপে এল. এ. পরীক্ষার্থী গণিতে দুর্বল ভ্রাতুষ্পুত্রের অঙ্ক শেখার সুবিধা হবে ভেবে। দীনেন্দ্রকুমার পেয়ে গেলেন গৃহশিক্ষক, বিদ্যালয়ের সহকর্মী এবং সাহিত্যসঙ্গী :

> "জলধরবাবু মহিষাদলে চাকরী করিতে আসিলেন।…… আমি আর জলধরবাবু একত্র বাস করিতাম। আমি তাঁহার নিকট অঙ্ক শিখিতাম। সেই সময় হইতে তিনি আমার 'মাষ্টারমশায়'। আমি তাঁহার নিকট গণিত বিদ্যা শিখিতাম বটে, কিন্তু সে সময় আমাদের সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না।"[১৭]

ইতিমধ্যে সাহিত্যিক হিসেবে দীনেন্দ্রকুমার আরও স্বীকৃতি পেয়েছেন। মহিষাদলে শিক্ষকতাকালে জলধরকে ছাড়াও তিনি একটি সাহিত্য-পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর কাকা স্বয়ং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কাকার বৈঠকখানায় মাঝে মাঝেই আনন্দের হাট বসে যেত। আসতেন কাঙাল হরিনাথের অন্যতম সাহিত্যশিষ্য ও সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক চন্দ্রশেখর কর (তখন তিনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সাব-ডিভিশনাল অফিসার), এসেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (তখন তিনি মেদিনীপুরের একাংশের জরিপ-সংক্রান্ত কাজের ভারপ্রাপ্ত)। কাকার বৈঠকখানার মজলিশের বিবরণ দীনেন্দ্রকুমারের কলমে শরীর পেয়েছে :

> "চন্দ্রশেখরবাবু কাকার বৈঠকখানায় আসিলে যেন আনন্দের বাজার বসিত। জলধরবাবুও সেই মজলিশে যোগদান করিতেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়·· তাঁহার কার্য্যস্থানে সুজামুটা পরগণায় যাইতে-ছিলেন ; সেই সময় আমার কাকা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া…আনিয়া-ছিলেন। …রাত্রিতে কাকার বৈঠকখানায় যে মজলিস হইয়াছিল, সেই

মজলিসে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বরচিত অনেকগুলি হাসির গান গাহিয়াছিলেন।......তিনি হাত ও চোখ মুখের এরূপ ভঙ্গীর সঙ্গে গাহিয়াছিলেন যে, শ্রোতার দল হাসির চোটে বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন।"[১৮]

এই সময় 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)।[১৯] আর ছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১৮৯০), 'নব্যভারত' (১৮৮৩) মাসিকপত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' (১৮৮৪) ইত্যাদি পত্রিকা। 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক তালিকায় তখনই দীনেন্দ্রকুমারের নাম সুমুদ্রিত।[২০] তিনি যা কিছু লিখতেন তা সাধারণভাবে ভারতী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হতো।[২১]

এসময় ভারতীর সঙ্গে তিনি এতটাই জড়িত ছিলেন যে, স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে 'সখী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হলে দীনেন্দ্রকুমার, জলধর সেন এবং মহিষাদল রাজ স্টেটের চিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মিলে সখী সমিতির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে দেন। চাঁদা সংগ্রহের সংবাদ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকা "মহিলা শিল্পমেলা ও সখি সমিতির ১২৯৮/১২৯৯ সালের এককালীন দান প্রাপ্তি" শিরোনামে প্রকাশ করে। দানের তালিকায় দেখা যায়:

"শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত মহিষাদল ১১ টাকা।"[২২]

মহিষাদলে থাকার সময়ই জলধর সেনের 'হিমালয়' ভারতীতে প্রকাশিত হতে থাকে। জলধর হিমালয় ভ্রমণকালে যে ডায়েরী রেখেছিলেন তা' অবলম্বন করে জলধর-কথিত কাহিনী দীনেন্দ্রকুমার কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। হিমালয় পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তা দারুণ জনপ্রিয় হয়। গ্রন্থটির বহু সংস্করণ হয়েছিল। বস্তুত দীনেন্দ্রকুমার জলধরের ক্ষুদ্র ডায়েরী অবলম্বন করে জলধরের সহায়তায় প্রচুর পরিশ্রম করে হিমালয় প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে মাস্টারমশায়ের গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। জীবন-সায়াহ্নে 'বসুমতী'র পাতায় স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় মাস্টারমশাই ও ছাত্রের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট: এক)।

মহিষাদলে থাকার সময় স্কুলের তদানীন্তন হেডমাস্টারমশায়ের প্রণোদনায় স্কুল গ্রন্থাগারে বেশ কিছু ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস আনা হয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমার অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে সেসব উপন্যাস পড়েছিলেন। সম্ভবত এই পাঠের অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে দীনেন্দ্রকুমারের জীবনে গোয়েন্দা গল্পের অনুবাদ ও রচনার বীজ উপ্ত করেছিল।

মহিষাদল-বাসের শেষপর্বে বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে জলধর সেন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে আলাদা বাসায় উঠে যান। এর অল্পদিন পরেই দীনেন্দ্রকুমার জজ আদালতে চাকুরি করতে গেলেন রাজসাহীতে। রাজসাহী তখন পূর্ববঙ্গ তথা বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শহর। সাহিত্য-জগতের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি শুধু রাজসাহীর সন্তানই নন, রাজশাহীতে চাকুরি বা অন্যসূত্রে তখন বাস করছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বঙ্গসাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০) তখন রাজশাহীর প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী এবং লেখক। জলধরের মতো তিনিও ছিলেন হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য, তা আমরা জানি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন দীনেন্দ্রকুমার। আর এক তরুণের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি অক্ষয়কুমার সরকার। এঁর পিতা হরকুমার সরকার ছিলেন বিদ্যা ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জন মানুষ। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি হরকুমারের অসামান্য অনুরাগ ছিল। তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরীটি ছিল দারুণ সমৃদ্ধ। তৎকালে প্রকাশিত সমস্ত সাময়িকপত্রের তিনি গ্রাহক ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার রাজসাহীতে এসে হরকুমারের বাড়িতে থাকার জায়গা পেয়েছিলেন। বাড়িটি সর্বদাই গুণীজন সমাগমে পূর্ণ থাকত। হরকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) তখন রাজসাহীতে যথেষ্টই আসতেন। এঁরা ছাড়াও রাজসাহীতে অবস্থানকালে দীনেন্দ্রকুমার দেখেছেন আরও অনেক লেখক সাহিত্যিককে। এই পরিবেশের সান্নিধ্যধন্য দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

> "আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাজসাহী সাহিত্যিকগণের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' তখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতেছিল [১৯ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩০২, পৃ. ৪২৭-৪০ থেকে শুরু করে ২০ বর্ষ, চৈত্র ১৩০৩, পৃ. ৭৫০-৫২ পর্যন্ত 'ভারতী'র পাতায় 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশিত হয়। যদিও এর প্রথমাংশ 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে বের হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। —লে.]। এই 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিবার জন্য অক্ষয়বাবুকে তখন কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত, আমি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। নকলনবিশী ও তর্জ্জমা দ্বারা এরূপ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। রাজসাহীর অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ

করিয়াছিলেন। রাজসাহী কলেজের প্রবীণ দ্বিতীয় শিক্ষক লোকনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 'চন্দ্রশেখরে'র সমালোচনা শেষ করিয়া লেখনীকে বিরামদান করিলেও, দেবী বীণাপাণির সেবায় প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তখন মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সত্যের আলোকপাতের কঠোব সাধনায় রত ছিলেন।"[২২ক]

এঁরা ছাড়াও বাজসাহীর জীবনে দীনেন্দ্রকুমার দেখেছিলেন : নাটোরের মহারাজা ও সাহিত্যসেবক জগদিন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্র-সুহৃদ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখকে। তৎকালে রাজসাহী থেকে সুরেশচন্দ্র সাহার সম্পাদনায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রণোদনায় 'উৎসাহ' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাকে ঘিরে শহরের সুধীজনের উদ্দীপনার অন্ত ছিল না।

বাজসাহী বাসকালে দীনেন্দ্রকুমার সর্বোপরি যে সাচিত্যসঙ্গী ও সুহৃদকে লাভ করেছিলেন তিনি হলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। বজনীকান্ত সেই প্রবাসে দীনেন্দ্রকুমারের অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছিলেন। বহুকাল পবে রজনীকান্তের স্মৃতিচারণ করে বন্ধুকৃত্য করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার।[২৩]

রাজসাহীতে থাকার সময় সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনায়ও দীনেন্দ্রকুমারের হাতেখড়ি হয়। শহরে ধর্মসভা নামে একটি বহু পুবাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতো। নিজস্ব ছাপাখানা থাকা সত্ত্বেও পরিচালনার দোষে প্রেস ও কাগজ দুই-ই চলত এলোমেলোভাবে। তখন এতে বিজ্ঞাপন, নিলাম ইস্তেহার হিন্দুধর্মের মহিমাকীর্তনকারী রসকষহীন কিছু প্রবন্ধ ছাপা হতো। কিছু গ্রাহক ছিল, চাঁদাও আদায় হতো কিন্তু কেউ হিন্দুরঞ্জিকা বিশেষ খুলেও দেখতেন না। তরুণের দল একে 'হিন্দুর গঞ্জিকা' বলে উপহাস করত। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্রজ্ঞানে রজনীকান্ত বা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মতো মানুষেরা পত্রিকাটিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন।

পত্রিকার প্রেস বা পত্রিকার ভাব একদা পূর্বোক্ত হরকুমার সরকারের হাতে এলে তিনি পত্রিকা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করলেন দীনেন্দ্রকুমারের উপর। পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজে তিনি এখানেই হাতে-কলমে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অবশ্য পত্রিকা চালনায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয়

দেওয়ায় হিন্দু-মোড়লদের চাপে তাঁকে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কাজ থেকে সরে আসতে হয়।

রাজসাহীর পর বরোদা। বরোদা প্রবাসে গিয়েও দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যের সঙ্গচ্যুত হলেন না। অরবিন্দর বাঙলা-শিক্ষকরূপে একত্রে দু'জনে বাস করতেন। সমস্ত দিন কাজ প্রায় কিছুই ছিল না। তাই দু'চোখ ভরে তিনি এই প্রবাসজীবন ও বরোদার প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি, প্রথা, পোষাক-খাদ্যাভাস, উৎসব-আনন্দ ইত্যাদি দেখবার সুযোগ পান। সামান্য হলেও মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন। অরবিন্দের ব্যক্তিত্বপূর্ণ, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং আভিজাত্য-চিহ্নিত জীবনযাত্রা দেখবারও সুযোগ পান দীনেন্দ্রকুমার। এই পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা তৎকালে এবং পরবর্তীকালে নানাভাবে তাঁর লেখনীমুখে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। বরোদা-প্রসঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধ ছাড়াও অরবিন্দ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।

বরোদার প্রবাস শেষে জলধর সেনের আহ্বানে কলকাতায় ফিরে আসবার পর সাহিত্যই দীনেন্দ্রকুমারের বাকি জীবনের জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতায় অবস্থান, সাময়িকপত্রের সম্পাদনকর্ম তাঁকে সাহিত্য-সঙ্গ ও চর্চার পটভূমিতে এনে দাঁড় করায়।

সাহিত্য-পরিমণ্ডলে আজীবন লগ্ন হয়ে থাকার ফসল সব সময়ই দীনেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রে ফলেছিল। সেই ফসলের পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যে।

দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্য-সম্ভার

প্রথম জীবন থেকেই দীনেন্দ্রকুমার নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর লেখক-জীবনের ধারাবাহিকতায় কখনও ছেদ পড়ে নি। পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ভীতি, অকৃতকার্যতা, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, স্থায়ী চাকুরির অভাব, অভিভাবকদের রক্তচক্ষু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারে নি—রচনাকর্ম থেকে কখনও বিরত হন নি তিনি। প্রথম জীবনে লিখেছেন নেশায়, পরবর্তী জীবনে লিখেছেন পেশায়, আবার কখনও লিখেছেন সাময়িকপত্রের জঠরপূর্তির তাড়নায়। তাঁর রচনা সংখ্যায় যেমন প্রচুর, বৈচিত্র্যে তেমনই বিপুল। অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে সাময়িকপত্রের পাতায়, অল্পই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে।

দীনেন্দ্রকুমারের বিপুল রচনাসম্ভারকে বিষয়ানুযায়ী নানা ভাগে ভাগ করে তার

বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায় :

১. উপন্যাস, ২. স্মৃতিকথা, ৩. পল্লীবিষয়ক রচনা—চিত্র-চরিত্র ইত্যাদি, ৪. গোয়েন্দা-গল্প, ৫. রঙ্গব্যঙ্গমূলক গল্প, ৬. গল্প, ৭. কবিতা, ৮. ইতিহাস ও সমাজ-ইতিহাস বিষয়ক রচনা, ৯. সমাজ-বিজ্ঞান, ১০. রাজনীতি-বিষয়ক রচনা, ১১. আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ, ১২. শিকার-কাহিনী, ১৩. ভ্রমণ-কাহিনী, ১৪. সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি।

রাজসাহী বাসকালে দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত রাজসাহী ধর্মসভার নিজস্ব ছাপাখানা তমোঘ্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটি সম্পর্কে গ্রন্থকার স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন :

> "এই সময় ধর্মসভার তমোঘ্ন প্রেস হইতে আমার একখানি ছোটগল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'বাসন্তী'। শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার 'নেশনে তাহার প্রশংসাসূচক ক্ষুদ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেইখানি আমার প্রথম পুস্তক।"[২২]

গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

> "অশেষ গুণসম্পন্ন, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্তবাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের করকমলে তদায় ভক্ত গ্রন্থকারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সমর্পিত।"

এই গ্রন্থ তিনটি গল্প স্থান পেয়েছিল : 'স্বপ্ন', 'সত্যঘটনা না ভৌতিক কাণ্ড?' এবং পতিতা'। প্রকাশিত হয় ২৪ আগস্ট ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ, শ্রাবণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। এর মাস কয় পরে দীনেন্দ্রকুমার রাজসাহী ত্যাগ করেন, শীতের শুরুতেই।

উপন্যাস

দীনেন্দ্রকুমার খুব বেশি সংখ্যায় উপন্যাস লেখেন। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসে আছে ইতিহাসের স্পর্শ। প্রথম উপন্যাসটি আবার বিশুদ্ধ উপন্যাস নয়। ইতিহাসের স্পর্শযুক্ত রহস্য উপন্যাস। এটি আবার মৌলিক রচনাও নয়—ফরাসী রহস্য-উপন্যাসের ভাবানুবাদ। অনুবাদের সময় ফরাসী পরিবেশ ও পাত্র-পাত্রী সব কিছুরই ভারতীয়করণ করা হয়েছিল। প্রথমে 'দাসী' পত্রিকায় (সম্পাদক : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ [১৮৭৬-১৯৬২]), এর সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়। পরে স্ব-সম্পাদিত 'নন্দনকানন' পত্রিকায় সমাপ্ত হয়ে ভাদ্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (৪ অক্টোবর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং রাজসাহী

বাসকালে প্রথম লেখা উপন্যাস হলেও এটি প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নয়। রচনার পশ্চাদপট সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন :

> "একদিন সন্ধ্যার পর তিনি [কবি রজনীকান্ত সেন] একটি ফরাসী ডিটেকটিভের গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়া দুই রাত্রিতে তাহা শেষ করেন। গল্পটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া তিনি আমাকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাকে রাজসাহী পাবলিক লাইব্রেরী হইতে সেই ফরাসী উপন্যাসের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আনিয়া দিলেন; আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দুই পরিচ্ছেদ লিখিলাম। ফরাসী ভূমি আমি রাজপুতনায় পরিবর্তিত করিয়া উপন্যাসের ফরাসী নায়ক-নায়িকাগুলিকে রাজপুতে পরিণত করিলাম। রজনীবাবু সেই দুই পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা অনুভব করি।"[২৫]

'অজয়সিংহের কুঠী'র রচনাকর্মের সঙ্গে আগাগোড়া রজনীকান্ত যুক্ত ছিলেন :

> "উহার নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির চরিত্রাঙ্কনে যে সকল ত্রুটি ছিল, রজনীকান্ত সযত্নে তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন এবং সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ডিটেকটিভ নভেলসমূহের মধ্যে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে—একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।"[২৫ক]

অজয় সিংহের কুঠী মোটামুটি জনপ্রিয়তা লাভ সমর্থ হয়েছিল। এর প্রথম সংস্করণ মাত্র আট মাসে ফুরিয়ে যায়, দ্বিতীয় সংস্করণও 'অল্পদিনেই নিঃশেষিত' হয়, এটি প্রকাশ করেছিলেন 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র তৎকালীন সম্পাদক জলধর সেন। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণও অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই রহস্য উপন্যাস দিয়েই পরবর্তীকালের গোয়েন্দা-গল্প লেখক দীনেন্দ্রকুমারের আবির্ভাব সূচিত হলেও অজয়সিংহের কুঠীতে সাধারণ উপন্যাসেরও অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সাধারণ উপন্যাস হিসেবেও এটি সুখপাঠ্য রচনা।

'হামিদা' দীনেন্দ্রকুমারের মৌলিক উপন্যাস। ৩০ আগস্ট ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বরোদা, গুজরাট থেকে প্রকাশিত হয়। এর আখ্যানভাগে ইতিহাসের স্পর্শ থাকলেও দীনেন্দ্রকুমার 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশ লিখেছেন :

> "কোনো কোনো পাঠক এই আখ্যায়িকাটিকে ঐতিহাসিক গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের সহিত ইহার আখ্যানভাগের

কোনো সংস্রব নাই বলিলেও চলে; আবশ্যকবোধে মধ্যে দুই একটা ঐতিহাসিক নাম এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা গিয়াছে—সে ঘটনাটি চিত্রল অভিযান।"

দীনেন্দ্রকুমারের আর একটি উপন্যাস 'নানা সাহেব'। গ্রন্থটির নামেই এর বিষয়বস্তুর প্রমাণ আছে। গল্পের কোথাও উল্লেখ না থাকলেও নানা সাহেবে শশীচন্দ্র দত্তের (১৮২৪-১৮৮৫) 'Shankar, Tale of the Indian Mutiny'-র বিশ্বস্ত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। নানা সাহেব প্রকাশিত হয় ১ জানুয়ারি ১৯২৯।

দীনেন্দ্রকুমারের মৌলিক উপন্যাস 'নায়েব মহাশয়' প্রথমে ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে, পরে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাসটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল :

> "অমর নাট্যকার দীনবন্ধুর অমর নাটক 'নীলদর্পণে'র পরবর্তী ঘটনার কাহিনী। নীল উঠিয়া যাওয়ায় ইংরাজ নীলকর জমিদার মূর্তিতে বাঙালী নায়েব দেওয়ানের সাহায্যে কিভাবে প্রজার শোণিত শোষণ করিয়াছে, নিরুপায় দরিদ্র প্রজা নিত্য শত অত্যাচার সহ্য করিয়া অবশেষে কি উপায়ে লোমহর্ষণ উৎপীড়নের উপযুক্ত প্রতিফলন দিয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত বিবরণ। উপন্যাসের আকারে পল্লীজীবনের নিখুঁত বিবরণ। দুর্দান্ত জমিদার ও দুর্বল প্রজার জীবনব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস। উপন্যাসের আকারে আগাগোড়া সত্য ঘটনা। প্রকাণ্ড উপন্যাস...... ।"

এই জাতীয় বিজ্ঞাপন কিভাবে একটি রচনার মূল্যায়নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রমাণ 'নায়েব মহাশয়।' "নীলদর্পণের পরবর্তী কাহিনী নিয়ে" উপন্যাসটি রচিত বলা হলেও নীলদর্পণের সঙ্গে এ-কাহিনীর যোগ নেই আদৌ। বস্তুতপক্ষে গ্রামীণ জমিদারদের, বিশেষভাবে দেশীয় কর্মচারী ও প্রশাসনের সহায়তায় সাহেব জমিদারদের অত্যাচারের ছবি এই উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য মাত্রায় ধরা পড়েছে। কাঙাল হরিনাথের যোগ্য শিষ্য এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে দারুণ অভিজ্ঞ দীনেন্দ্রকুমার তাঁর অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভিত্তির উপর উপন্যাসটির কাঠামো নির্মাণ করেছেন। 'নায়েব মহাশয়ে'র প্রধান আকর্ষণ এর চরিত্রসমূহ। উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের সবগুলিই জীবন্ত। বিশেষভাবে মুচিবাড়িয়া কর্ণসার্নের ভূতপূর্ব নায়েব সর্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল, তাঁর পুত্র মহাদেব

সান্যাল, শম্ভুনাথ ও পৃথ্বীশ সান্যাল, সাহেব মি. হামক্রি, অবসরপ্রাপ্ত পেনসনভোগী দারোগা মহাবীর সিং, মহাবীরের অবসর গ্রহণের পর নিযুক্ত নরেন দারোগা প্রমুখ চরিত্র অসামান্য দক্ষতায় অঙ্কিত। সর্বোপরি আছেন কুচক্রী নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই।

তৎকালীন গ্রামীণ প্রশাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে উৎকোচ-ভোগী প্রশাসনিক ব্যক্তিদের যোগাযোগের চিত্র ভারি চমৎকার ফুটেছে মহাবীর সিং বিহারী এবং নরেন দারোগার আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। মনুষ্য-চরিত্রের দোষগুণ, আলো-অন্ধকার, দুর্বলতা-সবলতার প্রতীক হলো মহাবীর সিং বিহারী কিংবা শম্ভুনাথ সান্যালের মতো মানুষেরা। যে মহাবীর সিং দারোগা থাকাকালীন অন্যায়-অত্যাচার-উৎকোচ গ্রহণের সঙ্গে জড়িত থেকেও দক্ষহাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত, সে-ই মহাবীরই নবাব-জমিদারের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ পদে যোগ দিয়ে হামক্রির দেওয়া প্রলোভন অনায়াসে জয় করেছে। এই উপন্যাসের সেরা চরিত্র অবশ্যই লোভী, চক্রান্তকারী, পদলেহী, ভণ্ড নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই।

গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়েছে দেশ-কাল-রাজনীতি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদি। দীনেন্দ্রকুমার এই উপন্যাসে বহু উপভোগ্য দৃশ্য উপহার দিয়েছেন। যেমন: নরেন দারোগার বদলি ও গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়কার দৃশ্য।

নায়েব মহাশয় উপন্যাসে বহুতর দুর্বলতা আছে। দুর্বলতা আছে কাহিনী বিস্তারে, বিন্যাসে—প্লট গঠনে, কাহিনী-উপকাহিনীগুলির চলন ইত্যাদিতে। এ-সত্ত্বেও উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সুখপাঠ্য। তাঁর সরস লেখনীর গুণে কাহিনীর ফ্রেমে চরিত্রগুলি কথায় বার্তায়, চাল-চলনে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ। যেমন: হামক্রির উৎকোচদানের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে মহাবীর সিং বিহারী চলে যাওয়ার পর সাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেয়ারা এব্রাহিমকে নায়েবকে ডাকতে আদেশ করলেন। ডাক পেয়ে নায়েব এব্রাহিমকে এই তলবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এব্রাহিম উত্তর দিল:

> "এব্রাহিম বলিল, "তা বুঝতে পাল্লে তো হুজুর এই ঝকমারির চাকরীতে জবাব দিয়ে এদ্দিন হেঁদুর গণৎকারের মতোন বগোলে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে গেরস্তর বাড়ী-বাড়ী দৈবিগ্যিগিরি কর্যা বেড়াতাম। সায়েব আপনারে ডাক্‌লো কি জন্যি, তা সায়েবের সামনে হাজির হল্যেই সমজাতি পারবা। সায়েব দারোগা বাবুকে ডাক্‌তি বকাউল্লা চাচাকে

পেঠিয়ে, আমাকে বুল্লে ডাক্ নায়েবকে। সায়েবের মুখখানা বড্ডা ব্যাজার-ব্যাজার ঠেক্‌লো।"

এই জাতীয় সরস-সাবলীলতায় উপন্যাসটি আগাগোড়া পরিপূর্ণ। উপন্যাসটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, এর বহু চরিত্র ও ঘটনাংশ সত্যমূলক—দীনেন্দ্রকুমার নিজে কিছুটা দেখেছিলেন এবং জমিদারদের অত্যাচার-অনাচার, সাহেব-জমিদার-দের জুলুমের কথা বিভিন্ন সূত্রে শুনেছিলেন। আমরা আগেই জেনেছি যে, কুমার-খালির কাঙাল হরিনাথকে আজীবন জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। তাঁর এক সাহিত্য-শিষ্য মীর মশাররফ হোসেন একদা 'জমিদার দর্পণ' লিখে শিষ্যকৃত্য করেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার তেমনই নায়েব মহাশয় লিখে গ্রামীণ অত্যাচার ও কায়েমী স্বার্থবন্ধনের অন্যদিককে উন্মোচিত করে হরিনাথের জীবনের শিক্ষাকেই কর্মে প্রয়োগ করেছেন।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল দীনেন্দ্রকুমারের লেখা একটি উপন্যাসের একটিমাত্র অধ্যায়, তাও যুগ্মভাবে। 'ভারতী' সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী পত্রিকায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। বিলাতের 'জেন্টেল উম্যান' পত্রিকার অনুসরণে ভারতীতেও বারোয়ারি উপন্যাসের প্রচলন করা হয়। উপন্যাসের নাম দেওয়া হয় 'নববর্ষের স্বপ্ন'। যাঁদের লেখা ভালো হবে তাঁদের স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ', 'হুগলীর ইমামবাড়ী', 'গাথা' ও 'বসন্ত উৎসব' উপহারস্বরূপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। 'নববর্ষের স্বপ্নে'র প্রথম পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন সরলা দেবী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শ্রীঅঃ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দীনেন্দ্রকুমার রায় ও শশিভূষণ বসু, চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সরলবালা দাসী। পাঁচটি পরিচ্ছেদে এই বারোয়ারি উপন্যাসটি সমাপ্ত হয় (ভারতী : আশ্বিন ১২৯৯)। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানানো হয় যে, দু'জনের লেখার একজনের প্রথমাংশ অপরজনের দ্বিতীয়াংশ ভালো হওয়ায় দুটি লেখা মিলিয়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হলো। 'নূতন ধরনের' এবং 'বারোয়ারি উপন্যাস'-ই বটে। দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীবধূ' উপন্যাসের কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে।

স্মৃ তি ক থা

দীনেন্দ্রকুমারকে আমরা স্মৃতিকথার আশ্চর্য ভাণ্ডারী এবং স্মৃতিলিপির আশ্চর্যতর কারিগর আখ্যা দিতে পারি। বস্তুত, দীনেন্দ্রকুমারের কাছে বাঙালিকে ঋণ

স্বীকার করতে হবে, আজ হোক, কাল হোক হাত পাততেই হবে—তাঁর স্মৃতি-কথামূলক রচনাগুলির জন্য।

দীনেন্দ্রকুমারের স্মৃতিচর্চার ভাণ্ডারটি পাওয়া যাবে তাঁর দুটি গ্রন্থ : 'সেকালের স্মৃতি', 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ'-এ এবং কিছু টুকরো রচনায়। শৈশব থেকে যৌবনকাল—নিজ জীবনের এই সময় পর্বের কথা তিনি সেকালের স্মৃতিতে লিখেছেন। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, শেষ হয়েছিল ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। দীনেন্দ্রকুমারের জীবৎকালে 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। গত ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন সঠিকভাবেই লেখা হয়েছে :

> "অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকার ধূলিধূসর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে দুই মলাটের মধ্যে এনে একালের পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল অমূল্য এই আত্মজীবনী—'সেকালের স্মৃতি।"

সত্যিই সেকালের স্মৃতি এক 'মহামূল্যবান স্মৃতিচারণা', 'সেকালের যুগ জীবনের এক বিশ্বাসযোগ্য' আলেখ্য। তাঁর স্মৃতিচারণায় দীনেন্দ্রকুমার সেকালের সমাজ-সাহিত্য-রাজনীতি, গ্রাম ও শহরজীবনের জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন। সেযুগের সাহিত্যজগতের ও সমাজক্ষেত্রের বহু খ্যাত-অখ্যাত চরিত্রের জানা-অজানা বহুদিক ও তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কলমে। এইভাবেই তাঁর স্মৃতিচারী চলচ্চিত্রে দেখা দিয়েছেন : দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, কখনও স্বর্ণকুমারী দেবী, কখনও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। দেখা দিয়েছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, যদুনাথ সরকারের মতো খ্যাতনামা মানুষ। কখনও দেখা দিয়েছেন জগদানন্দ রায়, কাঙাল হরিনাথ, কখনও-বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পাশাপাশি সমাজের সাধারণ পেশায় নিযুক্ত কত মানুষের কত আশ্চয চরিত্রই না দেখা দিয়েছে তাঁর কলমে। একই সঙ্গে ধরা পড়েছে জগৎ-জীবন-পরিবেশ।

সেকালের স্মৃতি ও তাঁর অন্য স্মৃতিচারণমূলক রচনাকে সেকালের 'দলিল' আখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা দীনেন্দ্রকুমার স্মৃতিচর্চাকে সাল-তারিখ কণ্টকিত করে তোলেন নি। অবশ্য সাল-তারিখ না থাকলেও কালগত পারম্পর্য মোটামুটিভাবে রক্ষা করেই স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। যাকে আমরা বলি 'কংক্রিট এভিডেন্স' বা

'হেভিওয়েট এভিডেন্স' তা এতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছবির পর ছবি। —মেহেরপুরের বাল্যজীবন, পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ, পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ও পরিবেশ. নিজ পিতা-পিতামহ, দেশাচার-লোকাচার, মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোকশ্রুতি, কৃষ্ণনগরে স্কুল-কলেজ জীবন, সহপাঠীদের পরিচয়, মহিষাদলে শিক্ষকতা-জীবন, মহিষাদল রাজপরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সাহিত্যসঙ্গীদের পরিচয় ও ব্যক্তিগত চরিত্রবৈশিষ্ট্য, রাজসাহীর জজ আদালতে চাকুরিকালে আদালতের আর্দালি থেকে সেরেস্তাদার, বেয়ারা থেকে জজ সাহেব পর্যন্ত সকলের চরিত্র, রাজসাহীতে সাহিত্যের আড্ডা, বরোদায় অরবিন্দের সান্নিধ্য, বরোদার জীবন, রীতিনীতি, রাজপরিবার—সব মিলিযে যেন এক দ্রুত ধাবমান চলচ্ছবি।

শুধুমাত্র এই বর্ণবিভঙ্গের জন্যই নয়, তাঁর স্মৃতি-ছবি অংশত সামাজিক-তথ্য হিসেবেও মূল্যবান, মূল্যবান বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক দিয়েও :

> "মেহেরপুর কাশিমবাজারের জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, মথুরাবাবু কাশিমবাজারের স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণনাথের নিকট হইতে মেহের-পুরের জমীদারী পত্তনী লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিশ্চিন্তপুর কনসার্নের নীলকর ম্যানেজার সাহেব অনেক কৌশলে রাজা কৃষ্ণনাথকে বশীভূত করিয়া যৎসামান্য অর্থব্যয়ে এই জমিদারী ইজারা লইয়া-ছিলেন।"[২৬ক]

কিংবা গ্রাম্যগৃহ-নির্মাণ-সংক্রান্ত এই তথ্যগুলি :

> "গৃহস্থিত আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রাদি রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা মাটীকোঠা নির্মাণ করিত। মাটীর দেওয়াল, সেই দেওয়ালের উপরে কাঠের 'আড়া' (কড়ি)। পল্লীগ্রামের গৃহস্থরা কাঁটাল-গাছের, জাম বা কডুই গাছের গুঁড়ি চিরিয়া এই সকল 'আড়া' প্রস্তুত করিত।"[২৬খ]

বঙ্গদেশে দেশলাইয়ের ব্যাপক-ব্যবহার শুরু হওয়ার আগের যুগে ধূমপানে অগ্নি ব্যবহারের এই বিবরণ যেমন আকর্ষণীয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ :

> "আজকাল পল্লীগ্রাম হইতে সিগারেট উঠিয়া গিয়াছে, সুলভ বিড়ি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; এজন্য সকলের 'কয়চেই' এক এক বাক্স দেশলাই।...কিন্তু সেকালে গাড়োয়ানেরা গেঁজের ভিতর তামাক, চকমকির পাথর, ইস্পাতের ঠুকনি, শোলা ও টিকে রাখিত। ধূমপানের

ইচ্ছা হইলে চকমকির পাথরে ঠুকনি ঠুকিয়া শোলা ধরাইত, এবং সেই শোলার আগুনে টিকে ধরাইয়া লইত।

আমার ঠাকুরদাদার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। এজন্য তাঁহার শয়ন-কক্ষে হুঁকা, কলকে, পোড়ানো মাটীর 'খঞ্জে' থাকিত। একটি খোপে কয়লা, চকমকির পাথর, ঠুকনি এবং শোলা থাকিত, মধ্যস্থলে একটি গোলাকার খোপ, তাহার ভিতর তামাক সংরক্ষিত হইত, এবং একটি খোপ খালি থাকিত ; ধূমপানের পর তাহার ছাই, ভস্মীভূত তামাকের গুল ঢালিয়া রাখা হইত।"[২৬গ]

এ-রকম অসংখ্য সেকেলে জীবনের তথ্য পরিবেশন ছাড়াও সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য আমরা দীনেন্দ্রকুমারের স্মৃতিকথামূলক লেখা থেকে পেয়ে যাই। যেমন : দ্বিজেন্দ্রলাল একবার রাজশাহী গিয়েছিলেন আবগারী বিভাগের পরিদর্শন-কাজে। সেই সময় রজনীকান্তের দু-একটি হাসির গান মাত্র রচিত হয়েছে। রজনীকান্ত সেগুলি দ্বিজেন্দ্রলালকে শোনালে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন হাসির গান রচনায়। এরপর থেকে রজনীকান্ত প্রচুর পরিমাণে হাসির গান রচনা করেন ও "পূর্ববঙ্গের হাসির গানের কবি হিসেবে পরিচিত হন।"[২৬ঘ]

এ-জাতীয় অজস্র তথ্যে তাঁর স্মৃতিমূলক লেখাগুলি পরিপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে দীনেন্দ্রকুমারের 'সেকালের স্মৃতি' শুধু তথ্য পরিবেশনেই নয়, সাহিত্যমূল্যের দিক দিয়েও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। আমরা সকলেই জানি যে, আত্মজীবনীর মধ্যে ব্যক্তির জীবনকাহিনী, জীবনীই পাওয়া যায় না—নিজ জীবনের আধারে লেখক সমকালীন একটি পরিমণ্ডলকে ধরে দেন পাঠকের সামনে। ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখা হলেও তা' শুধুমাত্র ব্যক্তির সম্পদ না থেকে দেশ-কাল-পরিস্থিতি, লেখকের সম্পর্কিত মানুষজন, তাদের অতি-ব্যক্তিগত জীবনের ভালো-মন্দের দিক, অনেক ছোটো-বড়ো ঘটনার ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। যে কথা জীবনীকারও লেখেন না, যা ইতিহাসে লেখা থাকে না অথচ ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান এমন অনেক কথা আত্মজীবনীকারের জীবনানুভূতির আলোয় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সুতরাং, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে—'আত্মজীবনী' ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী নয়। বাঙলা আত্মজীবনী-সাহিত্যের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী প্রায়শই দেখা যায় না। সকলেই জানেন যে, বাঙলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর সম্ভারটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' (কলকাতা ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৬৮)

সম্ভবত বাঙলায় লিখিত প্রথম আত্মজীবনী। বাঙলা ভাষায় লেখা আরও কয়েকটি সুপরিচিত আত্মজীবনী হলো :

বিদ্যাসাগর-চরিত, স্ব-রচিত, কলকাতা-১৮৮১।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবন-চরিত', কলকাতা, ১৩০৩।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ১৮৯৮।

রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, ১৯০৯।

নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন, ১৯০৮-১৯১৩।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, ১৯১৫।

মীর মশাররফ হোসেন : আমার জীবনী, ১৯১০।

শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, ১৯১৮।

বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৩২০।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্রোহে বাঙ্গালী, ১৯৫৭।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' : কলকাতা, ২৩২৬।

সরলাদেবী চৌধুরানী : জীবনের ঝরাপাতা, দেশ-২৫ কার্তিক ১৩৫১ থেকে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

নটী বিনোদিনী : 'আমার কথা' ও আমার অভিনেত্রীজীবন, ১৩১৯, রচনা সমগ্রে মুদ্রিত (১৩৯৪)।

জলধর সেনের আত্মজীবনী, কলকাতা ১৩৬৩ (এপ্রিল ১৯৫৬), প্রবর্তক পাবলিশার্স।

হরিনাথ মজুমদারের অপ্রকাশিত দিনলিপি, কুমারখালি।

ইত্যাদি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩১৯) এবং ছেলেবেলা (১৩৪৭) তো আছেই। আছে প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'-ও।

এই তালিকায় 'সেকালের স্মৃতি' বিশিষ্ট সংযোজন সন্দেহ নেই। কেননা, অধিকাংশ আত্মজীবনীতেই সমাজ-প্রতিবেশের পরিচয় থাকলেও মুখ্যত আছে নিজ জীবনের পরিচয় এবং নিজ জীবনের নানান বাঁক-মোড়ের কথা। কোনো কোনো আত্মজীবনীতে বিশেষভাবে পাওয়া যাবে লেখকের নিজ পরিবার-পরিজন এবং পরিবার-সংলগ্ন ব্যক্তিদের কথা। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যজীবন ও বোম্বাই প্রবাস' তো পুরোপুরি পরিবার-পরিজন ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের পরিচয়ে ভরা। সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় পরিচ্ছেদ ভাগ করে দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, তারকনাথ পালিত, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখকে তিনি যেভাবে দেখেছেন তা

সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও নিজ উপনয়ন, বাড়িতে পূজার্চনা, ব্যায়াম, শিক্ষা ইত্যাদি এবং দু'একজন শিক্ষকের কথাও আমাদের জানিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর রচনার একটু নমুনা দিলেই তাঁর আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> "ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্য গুরু।……
>
> অক্ষয়বাবুর একটা Standing desk ছিল। ঘরের মধ্যে পদচারণা করতেন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন—"ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার।"
>
> তখনকার কালে অক্ষয়কুমার দত্ত আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁরা বঙ্গভাষার দুই স্তম্ভ ছিলেন।"[২৬৬]

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলায় সমকালের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু আকর্ষণীয় তথ্য-বিবরণ দিলেও মুখ্যত নিজ জীবন, পরিবার-পরিজন এবং নিজের 'হয়ে ওঠা'র সরস বিবরণ দিয়েছেন—একথা আমরা জানি।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতেও নিজ জীবন ও কর্মের অনুষঙ্গে সেকালের সমাজ-প্রতিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন :

> "কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে দৃষ্ট কোন অপূর্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া, লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজভবনবৎ বাটীতে আমাকে ২/৩ দিন রাখেন।"[২৬৮]

বস্তুত জন্ম, বাল্যজীবন ও পরিবার-পরিচয় ছাড়া তাঁর আত্মজীবনীতে ব্রাহ্ম-সমাজের বিকাশে তাঁর প্রচেষ্টা ও ভূমিকার কথাই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে জগৎ ও জীবনের পরিচয় উদ্ঘাটনের যে দায়িত্ব আত্মজীবনীকারের থাকে তা প্রায়শই আমরা বাঙলা ভাষায় লিখিত আত্মচরিত-মূলক রচনায় পালিত হতে দেখি না। এ-দায়িত্ব কঠিন। রচনার মধ্যে লেখক ওতপ্রোত লগ্ন হয়ে আছেন অথচ 'আপনার দ্বারা আপনি আচ্ছাদিত' নয় বিষয়বস্তু। লেখকের চোখ দিয়েই কালকে, প্রতিবেশকে দেখা অথচ পাঠকের কাছে তা হবে নিজের চোখে দেখার মতোই জীবন্ত। পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় পূর্বতন সময় হয়ে উঠবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভালো-মন্দ, গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবনের কালাতিক্রমী সহায়ক শক্তি—মহৎ আত্মজীবনীর এ হলো প্রাথমিক লক্ষণ।

সরলা দেবীচৌধুরানীর 'জীবনের ঝরাপাতা' এই গুণে গুণান্বিত। ঠাকুরবাড়ীর ভালো পরিচয়ের সঙ্গে এখানে পাওয়া যাবে মন্দ পরিচয়ও :

> "বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনও চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলান নি। মাসিদের বাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তা-দিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বড়মানুষের মেয়েদের এই ছিল বনেদী পেট্রিশিয়ন চাল। গরীবের ঘর থেকে আসা ভাজেরা কিন্তু তাদের প্লিবিয়ান হৃদয় সঙ্গে করে আনতেন—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার আর এক রকমের দেখতুম।"[২৬ছ]

সরলা দেবীর লেখায় তাই শুধু নিজের কথাই নেই, ঠাকুরবাড়ির গৌরবময়-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে ও স্বকীয় স্বাধীন ভাবনার আলোকে তিনি তুলে ধরেছেন সঙ্গীতে, সাহিত্যে, ধর্মে, জাতীয় জাগরণে, বহুতর কর্মসাধনায় বাঙালির ব্যক্তিত্ব ও জাতি-সংগঠনের কথা। পুরোনো দিনের কলকাতা, ভারত তথা বঙ্গদেশের উনিশ শতকের শেষ দুই ও বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এক শিক্ষিতা মহিয়সীর কলমে। সেদিক দিয়ে জীবনের ঝরাপাতা অতি মূল্যবান রচনা।

বিস্ফোরক আত্মজীবনীর রচয়িতা হরিনাথ মজুমদার। একজন গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে নীলকর, জমিদার, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের কথা বিধৃত হয়ে আছে অপ্রকাশিত দিনলিপিতে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তার থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মধুময় ও ফলপ্রসূ করে তোলার সাধনায় নিরত কপর্দকশূন্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার উৎপীড়িত হয়েছেন জমিদারের দ্বারা, তবু কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি। উৎকোচ, প্রলোভন, ভীতিপ্রদর্শন কিছুই তাঁকে জমিদারের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে বিরত করতে পারে নি। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' পত্রিকায় অনলসভাবে লিখে গেছেন গ্রামীণ রায়তের অধিকার-প্রতিষ্ঠার কথা। সারাজীবন জমিদারের দ্বারা উৎপীড়িত হরিনাথের দিনলিপি তাই তিক্ত ও বিস্ফোরক। কেননা, পীড়নকারী জমিদার পরিবারটি হলো ঠাকুর-পরিবার। হরিনাথ তাঁর উক্ত আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন :

"...দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারীতে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইংরাজী কৌশল (পোলিশি) জমিদারদিগের অস্থি মস্তিষ্কে যতই প্রবেশ করিতে লাগিল, নাএবগণের স্বাধীনতা ক্রমেই নষ্ট হইল। তাঁহারা ছায়াবাজীর পুতুল হইয়া থাকিলেন। সূত্র কূটকৌশলপরায়ণ কলিকাতার বাবুদিগের হস্তে থাকিল। প্রজাগণও অত্যাচারিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ যে পর্যন্ত মহর্ষি নাম গ্রহণ করেন নাই, সে পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহাকে দুঃখ নিবেদন করিয়া কিছু কিছু ফল পাইয়াছে, কিন্তু তিনি মহর্ষি নাম পরিগ্রহ করিলে, তাহার পর প্রজার হাহাকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই। দুরবস্থা দেখিতে নিমীলিত চক্ষু উন্মিলিত হয় নাই। ...মহর্ষি অবসর গ্রহণ করিলে, যাঁহারা জমিদারী শাসনের ভার পাইলেন, তাঁহারা যতোধিক ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, ততোধিক কূটকৌশলবুদ্ধির অর্থাৎ ইংরাজ পোলিশির ক্রীতদাস।"[২৬জ]

এই দিনলিপি এমনই সব তথ্যে পূর্ণ যা আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে আঘাত দেয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামাজিক ও অর্থকৌলীন্যের চাবিকাঠিটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। হরিনাথ তাঁর দিনলিপিতে অনেকটা জায়গা নিয়েছেন 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' পত্রিকার প্রকাশ ও তার সংগ্রামের কথা বিবৃত করবার কাজে।

কিন্তু হরিনাথের পক্ষে নিজেকে আড়াল করা সম্ভব হয় নি, আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় আমরা তার প্রবল ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবোধের বিবরণই পাঠ করি। বিদ্যাসাগরের আত্মচরিতে আমরা যে বিদ্যাসাগরকে পাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কথিত 'পুরাতন-প্রসঙ্গে' (বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিত) অঙ্কিত বিদ্যাসাগর এক রকম নন। পুরাতন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্রের ইংরাজ-প্রীতি, দাম্ভিকতা ও পরশ্রীকাতরতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর কর্তৃক অবলম্বিত যে কৌশলের পরিচয় আমরা লাভ করি তা আত্মচরিতের বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তো মেলেই না, আমাদের জানা বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও মেলে না।

আত্মজীবনীকারের পক্ষে এটাও অন্যতম প্রধান সমস্যা। নিজেকে আড়াল করা, কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতাকে আড়াল করা নয়—স্বীকার করা। নিজের এবং আত্মজনের, কেননা, জীবনপথের যাত্রী কোনো মানুষই তো ভালো আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার, সু আর কু-এর দায় এড়াতে পারেন না—তিনি যত

বড়ো মাপের মানুষই হোন না কেন। ম্যাক্সিম গোর্কি যেমন 'পৃথিবীর পাঠশালা' আর 'পৃথিবীর পথে' নামক আত্মজৈবনিক রচনায় প্রায় অকপটে নিজ জীবন কাহিনীর সব কটি দিককে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনকেও তিনি দেখছেন সামগ্রিক সমাজ-পটের মুকুরে। কিন্তু বাঙলা আত্মজীবনীতে এই গুণটি প্রায়শ মেলে না। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী এজন্যই তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির ইতিহাস, হরিনাথ-বর্ণিত দেবেন্দ্রনাথকে এখানে পাওয়া যাবে না।

এদিক দিয়ে মীর মশারফ হোসেনের 'আমার জীবনী' ব্যতিক্রমী রচনা সন্দেহ নেই : দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মচরিতে যেমন তাঁর সমাজ-অনুশাসন-হীন প্রেম এবং নারীদেহের প্রলোভন জয় করার কথা লিখিত হয়েছে এবং কার্তিকেয়চন্দ্র প্রলোভন-জয়ের ইতিবৃত্তকে বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন—মীর তেমন 'আমার জীবনী'তে নিজ দুর্বলতাকে প্রায় অকপটে শালীনতা বজায় রেখে স্বীকার করেছেন। নিজ পিতা, আত্মীয়-পরিজনকেও যথাসম্ভব খোলাচোখে দেখেছেন মীর। ফলে তাঁর আত্মজীবনী স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে ওঠে।

সর্বাংশে না হলেও জলধর সেন তার আত্মজীবনীতে (লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু) এই গুণটিকে আয়ত্ত করেছেন। নিজ পিতার চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি তিনি অকপটভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

দীনেন্দ্রকুমারের স্মৃতিচারী রচনাসমূহ, বিশেষভাবে, 'সেকালের স্মৃতি'র প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি আত্মজীবনীমাত্র নয়, আত্মজৈবনিক রচনা। সেকালের স্মৃতি শুধু নিজের কথা নয় সেকালের কথা।—এ হলো একটি প্রজন্মের বেঁচে থাকার, গৌরবের, সংকীর্ণতার—মন্দ আর ভালোর জরুরী বিবরণী।

কী আশ্চর্য সারল্য ও মায়াবী ভঙ্গিতে দীনেন্দ্রকুমার স্মৃতিলিপি রচনা করেছেন তার নিদর্শন আমরা উদ্ধার করতে পারি 'কবি রজনীকান্ত' (অগ্রহায়ণ ১৩২৪, ভারতবর্ষ, পৃ. ৮৭৫) রচনা থেকে :

> "পূজার ছুটির পর একবার তিনি বাড়ি হইতে রাজশাহীতে যাইতেছিলেন; আমিও ছুটির শেষে রাজশাহীতে যাইতেছিলাম।······ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি, ষ্টীমারের ডেকের উপর একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রী তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মুখব্যাদান করিয়া গল্প গিলিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন কি ষ্টীমারের সারেঙ, সুখানি, ডাক্তার

পর্যন্ত তাঁহাকে কাতার দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জাহাজ পদ্মার প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহা আলাইপুর ছাড়াইয়া চারঘাট, সরদহ প্রভৃতি ষ্টীমার ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিল। কত মাল নামিল, উঠিল, কত বিদেশের যাত্রী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল, কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না। অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় ষ্টীমার রাজশাহীর ঘাটে নঙ্গর করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। সারেঙ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার কিচ্ছা বড়ো সরেস, এরকম কিচ্ছা আর কখনও শুনি নাই, বড়োই আপশোস যে, শেষ পর্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে দেরি হইবে, তাহা হইলে জাহাজ খুব ঢিমে চালাইতাম।"

দীনেন্দ্রকুমারের আর-একটি মহামূল্যবান স্মৃতিচারণা হলো 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থে শুধু এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথাই নেই, আছে সমকালীন রাজনীতি-সমাজনীতির কথাও। সাহসা দানেন্দ্রকুমার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে চলে আসা রাজনৈতিক বিষয়েও সম্পূর্ণ অকপট। প্রসঙ্গত আমরা জেনে যাই যে, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করার আগেই অরবিন্দ কংগ্রেসের কাযপ্রণালীর সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কাঙাল হরিনাথ সম্পর্কে স্মৃতিচারণও সেই মতো মূল্যবান। অবশ্য হরিনাথ যখন মারা যান তখনই দানেন্দ্রকুমারের বয়স খুব বেশি নয়, অন্তত হরিনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাওয়ার পক্ষে তাঁর বয়স অল্পই ছিল। দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

> "পূজনীয় জলধরবাবু একবার আমাকে কাঙ্গাল হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিবার ভার দিয়া কতকগুলি পুরাতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।"[২৬ক]

হরিনাথ সম্পর্কে তাঁর রচনা :

(ক) বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথ, মানসী, আষাঢ় ১৩২১।

(খ) কাঙালের স্মৃতিচর্চা, সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০।

(গ) কাঙ্গাল হরিনাথ, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, পৃ. ১০৫-১৫। ইত্যাদি

মূলত জীবনীজাতীয় রচনা হলেও হরিনাথকে তিনি যতটুকু দেখেছিলেন রচনাগুলিতে তার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি আছে :

> "বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণের নিকট যদি

আমাদের মাতৃভাষা ঋণী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার – হরিনাথের ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[২৬ক]

সেকালের স্মৃতির পাতায় পাতায় আছে গল্পের ভঙ্গিতে বর্ণিত সেকালের ইতিহাস—যেসব কথা কোনো ইতিহাস-গ্রন্থ লেখে না। এই স্মৃতিচারণ এ কারণেও উল্লেখযোগ্য যে দীনেন্দ্রকুমার এখানে সম্পূর্ণ অকপট, কি পাঠশালার গুরুমহাশয় সম্পর্কে, কি নিজের পিতার সম্বন্ধে, কি নিজের সম্বন্ধে! নিজের পিতার সাহিত্য-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা যেমন তিনি উল্লেখ করেন, তেমনই নিজের অকৃতকার্যতা ও সীমাবদ্ধতার কথাও অনায়াসে উল্লেখ করেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন, স্ত্রী-সন্তান প্রমুখের কথা সেকালের স্মৃতিতে বাহুল্য জ্ঞানে অনুল্লেখিত থাকলেও বাঁকিপুরের পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহময়ী স্ত্রী কিংবা রাজসাহীর হরকুমার সরকারের স্ত্রীর স্নেহ-করুণার কথা দীনেন্দ্রকুমার লিখে গেছেন, লিখে গেছেন মেয়েদের অবরোধ-মোচনের সন্ধিক্ষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবরণ। নিজ সীমাবদ্ধতাকে অকপটে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহস দেখিয়েছেন অপ্রিয় সত্য-উদ্‌ঘাটনে। চূড়ান্ত অপ্রিয় হবে জেনেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন জলধর সেনের হিমালয় রচনার কাহিনী কিংবা সমাজে শিক্ষিত ও অভিজাত হিসেবে বন্দিত, রবীন্দ্র-বন্ধু উচ্চ রাজকর্মচারী লোকেন্দ্রনাথ পালিতের অধস্তন কর্মচারীর প্রতি অমনুষ্যোচিত ব্যবহারের কথা। লোকেন পালিতের ঔদ্ধত্য-দাম্ভিকতা, ইংরেজি এটিকেটের হাস্যকর নকলনবিশী, মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের নির্লজ্জতার যে পরিচয় স্বল্পাক্ষরে দীনেন্দ্রকুমার দিয়েছেন, তা আমাদের স্তম্ভিত করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়: বাঙলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনার শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করেনি দীনেন্দ্রকুমারের রচনা, বরং স্মৃতি মিলেছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা জড়িত হয়েছে সততা ও সাহসের রসে—আর এসব কিছুই সরল সরস আর উপভোগ্য ভাষায়, ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

দীনেন্দ্রকুমারের রচনা-তালিকা লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে, ইতিহাস তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। সেকালের স্মৃতিতেও আমরা দেখি যে তিনি যখন যেখানে থেকেছেন, সেখানে স্থানীয় ইতিহাস যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপরাপর চিন্তাবিদগণের চেষ্টা ও যত্নে বাঙালির ইতিহাস-চর্চা শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের একদা এই খেদ ছিল যে, বাঙালির ইতিহাস নেই। শুধু বাঙালির ইতিহাস নেই তাই-ই নয় বাঙালির মধ্যে ইতিহাসচর্চার চলনও তৎপূর্বকালে প্রায় ছিলই না। ইতিহাস মানে তো শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস নয়; ইতিহাস মানে একটি জাতি বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের, সামগ্রিক জীবনচর্যার ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে বাঙালির ইতিহাস-চর্চায় বঙ্কিম যে ভিতরের তাগিদ অনুভব করেছিলেন পরবর্তী সময়ে বাঙালি ইতিহাস-চর্চাকারীদেরই তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত বা আন্তর্জাতিক ইতিহাসচর্চার তাগিদ।

দীনেন্দ্রকুমার নিজ জীবনে বেশ কয়েকজন মহান ঐতিহাসিকের সংস্পর্শে এসে-ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কিংবা যদুনাথ সরকারের কথা এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি।

'হামিদা', 'অজয়সিংহের কুঠী' কিংবা 'নানাসাহেব' উপন্যাসে ইতিহাসের স্পর্শ ও প্রসঙ্গ ছাড়াও দীনেন্দ্রকুমারের ইতিহাসচর্চার প্রতিনিধি স্থানীয় না হলেও মোটামুটি উল্লেখ্য নিদর্শন হলো 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট' গ্রন্থটি। এটি জীবনী-জাতীয় রচনা। নেপোলিয়ান-ভক্ত আবট সাহেবের গ্রন্থের এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে। মূলগ্রন্থের দোষগুলি অনুবাদেও বর্তেছে। সমকালীন পত্রিকায়, বিশেষভাবে 'বঙ্গদর্শনে'র মতো পত্রিকাতেও গ্রন্থটি মোটামুটি প্রশংসিতই হয়েছিল।[২৭]

এছাড়াও ভারত-ইতিহাসের নানা অধ্যায় নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার সাময়িকপত্রের পাতায় বহুতর প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত রচনা পাঠ করলে দেখা যায়: দীনেন্দ্রকুমার ঐতিহাসিক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ পাঠক। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকের কলমে নয় সাহিত্যিকের কলমেই তিনি ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, ফলে তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক রচনা যেমন তথ্যহীন নয়, তেমন তথ্য-ভারাক্রান্তও নয়। অতীত সময়, জীবন এবং ইতিহাসের চরিত্রাবলীকে তিনি জীবন্ত ও রক্তমাংসের মানুষ-হিসেবেই উপস্থিত করেছেন। ইতিহাস-বিষয়ে লিখতে গিয়েও দীনেন্দ্রকুমার অধিকাংশ সময় গল্প বলার মেজাজ ও ভাষা হারিয়ে ফেলেন নি। পাঠের দ্বারা আহৃত তথ্যসমূহকে তাই তিনি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে, নিজস্ব মাত্রায়। ফলে

এ-ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছেন।

দানেন্দ্রকুমারের ইতিহাসবোধের অপরদিকে আছে সমাজ-ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ও জাগ্রত কৌতূহল এবং সচেতনতা। ইতিহাস-বিষয়ে তাঁর প্রচুর পাঠের অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর লেখাতেই আছে। জাতিবিদ্যা, নৃতত্ত্ব—ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত নানান বিষয়ে তাঁর প্রবল সচেতনতাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত[২৮] 'অসভ্য জাতির সমাজনীতি' প্রবন্ধে দীনেন্দ্রকুমার আফ্রিকার বুশমেন বা বন্যজাতি, উত্তর আফ্রিকার হটেণ্টট জাতি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, গ্রীণল্যাণ্ডবাসী এস্কিমো, পাপুয়া দ্বীপের আদিম অধিবাসী, এলিউটি জাতি—ইত্যাদির জাতিতত্ত্ব, তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে দুটি প্রস্তাবে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার যে-সমস্ত রচনা ও গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে আছে :

(i) The Decent of man.

(ii) Col. Collin's in Philip Researches in South Afrika.

(iii) Captain Holm's Expedition in East Green-Land.

(iv) Dr. Rink's The Eskimo Tribes, Vol. XI.

(v) Dall's Alaska and its Resources.

এতগুলি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেও তিনি প্রবন্ধের মধ্যে পাণ্ডিত্য জাহির করার কোনো চেষ্টাই করেন নি। বরং আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতিসমূহের পরিচয় দিয়েছেন গল্পের মতোই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। তাঁর এই কৃতিত্ব এ-জাতীয় অন্যান্য রচনাতেও পাওয়া যায়। যেমন :

ক. পারস্যের গার্হস্থ্য ও রাজকীয় প্রথা (সাহিত্য, মাঘ ১৩০০, পৃ. ৭৪৯)

খ. জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরাজ দূত (ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৩, পৃ. ২৩৭)

গ. পার্সি-সম্প্রদায় (ভারতী, কার্তিক ১৩০১, পৃ. ৪১৩)

—ঐ—(দ্বিতীয় প্রস্তাব), (ভারতী, মাঘ ১৩০১, পৃ. ৫৮৬)

ঘ. ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ. ৪৪১)

ঙ. বরোদার জাতিতত্ত্ব (ভারতী, আষাঢ় ১৩০৬, পৃ. ২১৬)

চ. গুজরাটে হিন্দুবিবাহ (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৬, পৃ. ৭২২)

—এছাড়াও আরও বহু রচনা।

ইত্যাকার রচনার মধ্যে আমরা দীনেন্দ্রকুমারের দ্রবীভূত মনীষার পরিচয় লাভ করি—যা পণ্ডিতির খোঁচায় উদ্ধত নয়, তাত্ত্বিকের আপন শুষ্ক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষণ নয়; অনুভবের দ্বারা নম্র ও হার্দ্য! এই সমস্ত রচনার মধ্যে যদি কোথাও শ্লেষ বা ব্যঙ্গ থেকেও থাকে তবু তা-ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের কলুষ থেকে মুক্ত। দীনেন্দ্রকুমারের ইতিহাসবোধ যে বিশেষভাবে দেশ-কাল-সমাজের ধারায় অবিচ্ছিন্ন, মাটি আর মানুষের সার্মগ্রিক বেঁচে থাকার সঙ্গেও প্রকারান্তরে লগ্ন হয়ে আছে তা আমরা আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাব।

বি ষ য় ঃ রা জ নী তি

দীনেন্দ্রকুমার ব্যক্তিগত জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অথচ পরাধীন ভারতের একজন সংবেদনশীল, সচেতন মানুষ ও স্রষ্টা হিসেবে তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই রাজনীতিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে থাকা অসম্ভব ছিল সেকালে। কেননা, বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন পর্যন্ত—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রায় সবটাই ঘটেছিল দীনেন্দ্রকুমারের চোখের উপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছরগুলিকে দীনেন্দ্রকুমার দেখে গেছেন।

সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দীনেন্দ্রকুমার হয়তো সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন অংশগ্রহণ করার কথা চিন্তাও করেন নি, সঙ্গে পারিবারিক চাপ, দায়িত্ববোধ তো ছিলই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর অনতি মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালের পরিবর্তনমান দেশীয় ও বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতে রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর জীবনে কিছু-না-কিছু দাঁড়িয়ে গিয়েছিলই—এমন অনুমান অসম্ভব নয়।

বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই রাজনৈতিক বিশ্বাসবোধের দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে রহস্য ও হত্যা তাঁর অন্যতম প্রিয়-প্রসঙ্গ হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসাকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষলগ্নে সেকালের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'জাতীয় মহাসমিতি' বা জাতীয় কংগ্রেসের দিকেই। প্রাথমিকভাবে কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী ও কর্মনীতির প্রতি দীনেন্দ্র-কুমারের আস্থা জন্মেছিল। তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতোই তিনি দৃষ্টি রেখে-

ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলির কাজকর্মের দিকে ও জমিদার সভা তথা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে। ভারতী পত্রিকায় রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার কংগ্রেস অধিবেশনের সংবাদ, প্রস্তুতির বিবরণ, বোম্বাই অধিবেশনের রিপোর্ট ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করে মন্তব্য করেছেন :

> "এই মহাসমিতির কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ; যে বীজ এই মহাসমিতিতে রহিয়াছে, তাহা হইতে সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে।"[২৯]

বঙ্গীয় ব্যাপস্থাপক সভার অধিবেশন ও আলোচনার সংবাদও যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন দীনেন্দ্রকুমার, মন্তব্য করেছেন ইংরাজ সরকারের আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে। প্রাথমিক বিচারে অবশ্যই তাঁর সীমিত রাজনৈতিক মতকে নিয়ন্ত্রণ করেছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই। কিন্তু তারও চেয়ে অধিক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার। আমরা সকলেই জানি যে, ভারতে ব্রিটিশের কূট-কৌশল ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতি ছলে বলে-কৌশলে একের-পর-এক দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করেছিল, হস্তগত করেছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে। দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্বভাবসুলভ শ্লেষের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই লোলুপতাকে বিদ্ধ করেছেন। কাশ্মীর রাজ্য হস্তগত করার চক্রান্ত দীনেন্দ্রকুমারের কলমে এই ভাষায় ধরা পড়েছে :

> "কাশ্মীর লইয়া আজকাল প্রবল আন্দোলন চলিতেছে ; ..... কাশ্মীর এখন ব্রীটিস্ সিংহের করতলগত, আজও উদরস্থ হয় নাই ; যতদিন উদরস্থ না হইবে, ততদিনই নানা লোকে নানা কথা বলিবে।" (কাশ্মীর ব্যাপার)[৩০]

স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য হস্তগত করার জন্যও ইংরাজ সরকার একই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ-ব্যাপারে দীনেন্দ্রকুমারের প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র :

> "কাশ্মীরের ব্যাপার শেষ হইতে না হইতে ত্রিপুরা গোলযোগ বাধিয়া উঠে এবং কাশ্মীর রাজ্যের অনুকরণে তিনিও [ত্রিপুরার রাজা] রাজ্যত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। (ত্রিপুরা রহস্য)।[৩১]

শুধুমাত্র দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করাই নয়, সমগ্র এশিয়া-জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের রাজ্যগ্রাস-নীতি, স্বাধীন জাতিগুলির বিরুদ্ধে সমরাভিযান এবং নিজ স্বার্থের সপক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার খরচ কর-হিসেবে পদানত দেশগুলির দরিদ্র

জনসাধারণের কাছ থেকে আদায়ের বিরুদ্ধে দীনেন্দ্রকুমারকে আমরা সোচ্চার হতে দেখি। চীনের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্লেষের সঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> "...এই চীন জাতির কি অপরাধ তাহা প্রকাশ হয় নাই, বোধ হয় ব্রীটিস্ সিংহের অধিকারের নিকট স্বাধীনভাবে বাস করিবার দুরাশাই ইহাদের একমাত্র দোষ।" (চীন সংগ্রাম).[৩১]

অতঃপর ব্রহ্মযুদ্ধের খরচ চালানোর জন্য ইংরাজ সরকার নানান দ্রব্যের কর বৃদ্ধি করে এবং 'ইনকাম ট্যাক্স' চাপিয়ে দেয় পদানত দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়ে। দীনেন্দ্রকুমার এসম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

> "এক ব্রহ্মসমরে আমাদের এত দুরবস্থা! কি কুক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল যে নানা কৌশলে টাকা তুলিয়া—লবনের মাশুল বৃদ্ধি করিয়া, ইনকাম ট্যাক্স সৃষ্টি করিয়াও—প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে শূন্যভাণ্ডার হইতে হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম এই 'যমের মাতৃশ্রাদ্ধে' ২½ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে, এখন শুনিতেছি বিলাতে ঠিক খবর বাহির হইয়াছে যে ২½ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। একেই বলে 'পুকুর চুরি'।"[৩৩]

ইনকাম ট্যাক্সের বোঝা চাপাবার বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত আরও চমকপ্রদ :

> "আমাদের বিশ্বাস ছিল—ইনকাম ট্যাক্সটা দিন কতকের জন্য। গভর্নমেণ্টের বাজ্যে খরচটা কমিলেই আমরা এ পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি সেটা দৃঢ়মূল হইয়া বসিল।"

তাঁর মতে যাদের যথেষ্ট ইনকাম আছে সরকার তাদের কাছ থেকে এই ট্যাক্স আদায় করলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু গরীব মানুষের উপর ট্যাক্স চাপানো অন্যায় :

> "গরীবের 'ইনকম' শুধু নামে, তাহাদের প্রতি এটা থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে।"

সর্বপ্রকার করবৃদ্ধির অন্ধ-বিরোধিতা অবশ্য করেন নি দীনেন্দ্রকুমার। পল্লীগ্রামের উন্নতির জন্য, বিশেষভাবে পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার করবৃদ্ধির প্রস্তাব করলে তিনি নিমরাজি হয়ে প্রায় শর্তসাপেক্ষে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করছেন :

> "আমরা স্বীকার করি ইহাতে [করবৃদ্ধিতে] দরিদ্র লোকের কষ্ট কিছু বাড়িবে, কিন্তু যখন এত সহ্য হইতেছে, তখন ভবিষ্যৎ উন্নতির অনুরোধে

এটুকু সহ্য করাও অন্যায় নহে। সমুদ্রে যাহারা শয্যা শিশিরপাতে তাহার ভয় করিয়া কি হইবে, বিশেষ শিশিরপাত যখন উপকারের জন্য।"[৩১]

উপরের অংশের অনবদ্য শ্লেষ আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। প্রজাহিতৈষী, পল্লীপ্রেমী, নির্লোভ ও নির্ভীক-প্রতিবাদী কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের প্রতি বাল্যকালে প্রবল আকর্ষণের জন্যই হোক, কিংবা নিজ প্রবণতার জন্যই হোক—দীনেন্দ্রকুমারের দেশভাবনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তাই আমরা দেখি, ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে ছোট নাগপুরের কোল বিদ্রোহকে তিনি 'রাজনৈতিক সংবাদে'র পর্যায়ভুক্ত করেছেন। খোলাখুলি জমিদার ও তাদের পৃষ্ঠপোষক প্রশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করলেও দীনেন্দ্রকুমার তর্জনী-সংকেত করেছেন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখেছেন তিনি :

> "ছোট নাগপুরের আরণ্য প্রদেশে কোল জাতির বসতি। জমিদারগণ নাকি ইহাদের জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন ও ইহাদিগকে ধরিয়া বেগার খাটাইতেছেন—তাই ইহারা বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। বিদ্রোহী কোল জাতির রক্ত-স্রোতে বোধহয় শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইবে।"[৩৫]

তারও চেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো চা-বাগানে কুলি চালান এবং কুলি আইন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য। চা-বাগানে কুলি চালান দেওয়া, তাদের জোর ক'রে, কৌশল ক'রে চা-বাগানে কাজ করতে বাধ্য করা, কুলিদের উপর চা-কর বা বাগান-মালিকদের সীমাহীন নির্যাতন এক সময় বঙ্গদেশে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। একদা নীলকরদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল, চা-কর সাহেবদের অত্যাচারও তেমন ছিল নিন্দিত। নীলকরদের অত্যাচার প্রদর্শনের জন্য যেমন দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ (১৮৬০) লিখেছিলেন, তেমনি 'চা-কর দর্পণ' নাটক লিখেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। 'চা-কর দর্পণে'ই যে শুধুমাত্র চা বাগানের কুলিদের উপরে অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা' নয়, সমকালেই 'কুলী কাহিনী' প্রকাশ করেন জি. সি. হোম। এ ছাড়া যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন 'চা-কুলীর আত্মকাহিনী'তে। সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সাময়িকপত্রে চা-কর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত হয়। সেকালে প্রচলিত কুলি-

আইনের অসারতা এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনে সরকারের অনীহা সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার তীব্র ভাষায় লিখলেন :

> "সংবাদ আসিয়াছে যে, আসামে কুলি পাঠান সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বিলাতে প্রকাশ হইয়াছে ; আমাদের ছোট লাট বাহাদুর ও আমাদের চিফ কমিশনার সাহেব উভয়ে মিলিয়া কুলি চালান প্রথার সংশোধন করিতেছেন এবং কুলিদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সু-বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া স্টেট সেক্রেটারী নাকি আর এ আইন সংশোধনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। স্টেট সেক্রেটারী মহাশয় মনে করেন যে, কুলিদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, কুলিদের এ সমস্তই অলীক অথবা অতিরঞ্জিত কথা। কুলির দল যে দুরন্ত চা-করদিগের কঠোর শাসনে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার আগার শ্বেতদ্বীপের সুন্দর প্রাসাদে বসিয়া যিনি দেবদুর্লভ সুখ, সম্মান উপভোগ করিতেছেন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন ? ব্রীটিস্ কবি সেকস্পীয়ার কি অনর্থক বলিয়াছেন যে—
>
> "He jest at scars who never felt a wound".[৩৬]

'জাতীয় মহাসমিতি ও তাহার বিরোধী সম্প্রদায়' এবং 'পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান-দিগের অন্তর্বিবাদ এবং আমাদের জাতীয় মহাসমিতি' প্রবন্ধদ্বয়ও (প্রকাশ : ভারতী পত্রিকায় যথাক্রমে চৈত্র ১২৯৮, পৃ. ৬৪১ এবং জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, পৃ. ৬৫) দীনেন্দ্রকুমারের রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিচয়বাহী। আমরা আগেই বলেছি যে, অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতো জাতীয় কংগ্রেসকেই তিনিও ভারতীয় জাতীয়তা-বোধের প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষের যুগ স্বয়ং তাঁকে কংগ্রেস নামক জাতীয় মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট করেছিল মানসিকভাবে। সবে যখন কংগ্রেস ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল সেই ক্ষণটির চমৎকার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার :

> "এ সময় (১৮৯৮-১৯০০) কংগ্রেসের শৈশবাবস্থা। কংগ্রেস তখন বাঙ্গালার সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া জীবনশক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।"[৩৭]

কংগ্রেসকে দীনেন্দ্রকুমারের মানসিক সমর্থনের ব্যাপারটি নিঃশর্ত ছিল না। তিনি পরবর্তীকালে কংগ্রেসের বিভিন্ন নীতি-সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ

যেমন কংগ্রেস-সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্রের নিষ্ক্রমণ এবং গান্ধিজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতাদের সুভাষচন্দ্র-বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন—দীনেন্দ্রকুমার তেমনই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাংলা ও বাঙালির প্রভাব হ্রাস, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস নেতাদের পরিকল্পিত বাঙালি-বিরোধী ভূমিকা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন :

> "বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন, কালী বন্দ্যো, উমেশচন্দ্র, যাত্রামোহন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সেবায় তাহার দেহে শক্তি সঞ্চার করিতেছিলেন। একালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল নেতা কংগ্রেসের মোড়লী ভার গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালাকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের অস্তিত্বও ছিল না। অন্যের কথা দূরে থাক, মহাত্মা গান্ধীর সহিতও কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না, তিনি তখন সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখনও তিনি 'মহাত্মা' হইতে পারেন নাই।
>
> ...
>
> এরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানের নানা দোষ-ত্রুটি এখনও আছে, সেকালেও ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সাধারণতঃ সেদিকে আকৃষ্ট হইত না, অনেকে সে সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিতেন।"[৩৮]

শেষোক্ত বাক্যেই সেকালের শিক্ষিত সমাজ-কর্তৃক কংগ্রেসকে সমর্থনের চরিত্র বোঝা যায়। বরোদায় অরবিন্দের সান্নিধ্যও কংগ্রেসের প্রতি দীনেন্দ্রকুমারকে সন্দিহান করে তুলতে পারে, কেননা, অরবিন্দ তার আগে থেকেই কংগ্রেসের প্রতিকূল সমালোচক ছিলেন। কংগ্রেসের কার্যকলাপ দীনেন্দ্রকুমারকে এতটাই হতাশ করেছিল যে তিনি গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উন্মাদনারও সমালোচনা করেছেন :

> "এদেশে এরকম হোটেল অনেক আছে—যেখানে ধলা ভিন্ন কালার প্রবেশ নিষেধ। অথচ আমরা মুচি মুদ্দোফরাসদের লইয়া 'সার্বজনীন দুর্গোৎসবে'র জন্য ক্ষেপিয়াছি! রঙ্গমঞ্চে পর্যন্ত তাহাদিগকে 'মন্দির প্রবেশ' করাইবার জন্য হাততালির লোভে নাটক লিখিতেছি। যাহারা নানাভাবে অন্যকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই আমাদের দেশ হইতে অস্পৃশ্যত বিলোপের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে; বঁড়শিতে অস্পৃশ্যতা

টোপ গাঁথিয়া আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া বলিতেছে—রাঘববোয়ালের মতো কপ করিয়া গিলিয়া ফেল, তৎক্ষণাৎ স্বরাজচন্দ্র উদ্বাহু বামনের করতলগত হইবে।"

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রতি দীনেন্দ্রকুমারের এই বিরক্তির কারণ যে সাম্প্রদায়িক পশ্চাদপদতা নয়, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নামে ভণ্ডামীর প্রতি অনীহা তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে হুজুগপ্রিয়তা এবং সংগঠিত হওয়ার সমস্যা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি ভালোই সচেতন ছিলেন, ফলে পরক্ষণেই লিখেছেন :

> "সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইলে যে বিরাট শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি ছিল সন্ন্যাসি শিরোমণি ভগবান তথাগতের, সে শক্তি ছিল প্রেমের অবতার মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের, যাহার কণ্ঠ হইতে এক দিন অগ্নিরাশি নিঃসারিত হইয়া সমগ্র ভারতের জড়তা ও সংকীর্ণতা ভস্মে পরিণত ক রতে উদ্যত হইয়াছিল, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের সেই অদ্ভুতকর্মা মতিমান্ ভক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভগবদাশীর্ব্বাদে সেই অমোঘ শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এখন যাঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সে শক্তি, সে সাধনা, সেই বিশাল আত্মনির্ভরতা ও নিষ্ঠা কোথায়? মহাকবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,—
>
> "ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে জন বিরল।"[৩৯]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে যদি কিছু বিশ্বাসজনিত অতিশয়োক্তি থাকে, তবে সেটুকু বাদ দিয়েও দীনেন্দ্র-কথিত 'ভেঙ্গে গড়ার' মতো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ববিরলতাকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে, জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করেছি। বহু স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে দীনেন্দ্রকুমারের মনোভাবের পরিচয় ভালোভাবেই পাওয়া যায় :

> "কি এদেশে, কি বিলাতে এতকাল অর্থবলই স্বাধিকার প্রমত্ত হইয়া সমাজের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে; ধনবলই জনশক্তির ভাগ্যবিধাতা ছিল। ধনী 'ক্যাপিটালিস্ট'-রা শ্রমের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত, শ্রমজীবী তাহাই মাথা পাতিয়া লইত; শ্রম চিরদিনই উপেক্ষিত হইত; এবং শ্রমজীবীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ও দেহের রক্ত জল করিয়া যাহা উৎপাদন করিত, ধনী তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিত। দরিদ্রের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া যে টাকার পাহাড়

নির্মিত হইত, ধনী তাহারই চূড়ায় ব'সিয়া ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া তাহার সম্পদ ও সৌভাগ্যের জনকস্বরূপ দরিদ্র শ্রমজীবীর 'কর্ণমর্দ্দন' করিত, এবং তাহাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দুই এক টুকরা উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিত; কিন্তু তাহাতে দারিদ্রের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত না, তাহাদের বস্ত্রাভাব দূর হইত না, রোগে ঔষধ ও পথ্য সংগৃহীত হইত না! আমরা কুলির মত খাটিয়া মরিব, আর টাকাওয়ালারা আমাদের শ্রমের ফলভোগী হইয়া চিরদিন 'নবাবী' করিবে, বৈধ ডাকাতির ফলে আমাদের উপার্জ্জিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া আমাদের বুকের উপর দিয়া মোটর হাঁকাইবে, যেন তাহাদের টাকাই সব, আমাদের পরিশ্রম কিছুই নহে!—দরিদ্রের শ্রম এই ভাবেই এতকাল স্বীয় অধিকারে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এতকাল পরে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহারা নিজেদের শক্তি বুঝিতে পারিয়াছে; তাই তাহারা ধনের একচেটিয়া অধিকারকে পঙ্গু করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা আর উপবাস করিয়া তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ধনীর ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য নির্বিকার চিত্তে ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত নহে; তাহাদের যেটুকু প্রাপ্য তাহা আদায় করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে।—ধন ও শ্রমের যুদ্ধের পরিণাম কি, এবং কোথায় ইহার শেষ, এখন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু সভ্যজগতের প্রায় সর্বত্রই এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; এবং ইহা যে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ধনের শ্রমের বিরোধ ও তাহার ফলে শ্রমজীবীগণের জয়, এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়।"[৪০]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও দীনেন্দ্রকুমারের মনোভাব সম্পর্কে জানতে হলে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বলে বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই, বিশেষভাবে, যদি আমরা মনে রাখি যে, উপরোক্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের মাত্র তিন বছরের মাথায় এবং ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের অঙ্কুরোদ্গমের যুগে। সে যুগে দাঁড়িয়ে এক পরাধীন দেশের প্রাদেশিক ভাষার লেখকের পক্ষে শ্রমজীবীদের জয়ের নিশ্চিন্ততা সম্পর্কে এই দৃঢ়-ভাষণ অসাধারণ সন্দেহ নেই। ভারতের জাতীয়-সংগ্রামের পরস্পরবিরোধী ধারা, নেতৃত্বের বাগাড়ম্বর, দীর্ঘ-সূত্রিতা, কালক্ষেপ, পারস্পরিক অবিশ্বাস, হানাহানি, সর্বোপরি ভণ্ডামীতে তিনি সম্ভবত কিঞ্চিৎ হতাশাক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই জীবন-সায়াহ্নে পৌছে (১৩৪২

বঙ্গাব্দে) বরোদা প্রবাসকালের চল্লিশ বছর পূর্বে জনৈক মি. ফাড্‌কের সঙ্গে আলোচনার স্মৃতি টেনে এনে বলেছেন :

> "ফাড্‌কে…উৎসাহভরে বলিলেন, সমগ্র ভারত আজ মহামিলন ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, আমার জাতীয় জীবনে প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তিলক মহারাজা আমাদের জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত। সমগ্র ভারত রুদ্ধ নিশ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত নবজীবনের বাণী শ্রবণ করিবে। নিশাবসানে সুপ্ত ভারতকে জাগাইবার জন্য তাহা বিহঙ্গ কণ্ঠের প্রভাত রাগিণী।
>
> মনে হইতেছে, সে ১৩০২ সালের কথা। তাহার পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমগ্র ভারত হইতে কোটি কণ্ঠে—নরনারীকণ্ঠে সাড়া পাইয়াছি কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যপথে পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি ?"[৪১]

বিচিত্র ফুল বিচিত্র ফসল

বিষয়ের দিক দিয়ে দীনেন্দ্রকুমার যে বৈচিত্র্যের সাধনা করে'ছিলেন অতি-সংক্ষেপে আমরা তার পরিচয় গ্রহণ করব। তা পরিমাণেও বিপুল। প্রায় ষাট বছর ধরে তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যরচনায় ব্রতী ছিলেন—এই সময়ের মধ্যে নানান বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেমন : আন্তর্জাতিক বিষয় এবং বৈদেশিক সমাজ, জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী।

দীনেন্দ্রকুমারের এই জাতীয় রচনার উৎস প্রচুর গ্রন্থ ও দেশ-বিদেশের পত্রিকা-পাঠের অভিজ্ঞতা। দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক বিষয়ে বিচিত্রস্বাদের প্রবন্ধ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বস্তুত নিজ রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মানসবিহার করেছেন সমগ্র বিশ্বে, পরিক্রমা করেছেন আমাদের এই গ্রহ। এই জাতীয় রচনার কয়েকটির নামোল্লেখ মাত্র আমরা করতে পারি :

ক. ইয়ুরোপীয় ও মার্কিণ শ্রমজীবী : সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ. ১০০।

খ. ঐ সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০১, পৃ. ১৮৫।

গ. ইংল্যাণ্ডে গার্হস্থ্য-জীবন (মিস এ. মরিসের প্রবন্ধের অনুবাদ) ভারতী, ভাদ্র ১২৯৯, পৃ. ২৫২।

ঘ. পারস্যের অরাজকতা : ভারতী, শ্রাবণ ১২৯৯, পৃ. ১৮৭।

ঙ. বিলাতী কুসংস্কার : ভারতী, মাঘ ১২৯৯, পৃ. ৬০৪ (পূর্বে উল্লেখিত)।

চ. মিশরদেশীয় সংবাদপত্র : ভারতী, আশ্বিন ১৩০০, পৃ. ৩৫১।
ছ. পারস্যের পার্হস্থ্য ও রাজকীয় প্রথা : সাহিত্য, মাঘ ১৩০০, পৃ ৭৪৯।
জ. শ্যাম ও শ্যামের আভ্যন্তরিক অবস্থা : ভারতী, ফাল্গুন ১৩০০, পৃ. ৬৮০।
ঝ. শ্যামের রাজান্তপুর : ভারতী, চৈত্র ১৩০০, পৃ. ৭২০।......

ইত্যাদি বহুতর প্রবন্ধ। এগুলির অধিকাংশই মৌলিক রচনার মর্যাদা পাবে না, তথাপি সরলভঙ্গিতে দীনেন্দ্রকুমার বৈদেশিক বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

স্মৃতিচারণের মতোই দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যভাণ্ডারে আছে কয়েকটি উপভোগ্য ভ্রমণকাহিনী। কোনোভাবেই আমরা তাঁকে ভ্রমণকারী বা পর্যটক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। নামি-দামি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণের মতো অবকাশ তাঁর জীবনে প্রায় ঘটেই নি—ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়ই, ভেতরেও নয়। তবু আমরা তাঁর দেখার চোখের পরিচয় পাই অতি-অকিঞ্চিৎকর স্থানে ভ্রমণের লিপিকুশল অভিজ্ঞতা থেকে।

সেকালের স্মৃতি'র মধ্যে বস্তুত পূর্ববঙ্গের নদ-নদী ও জলপথ-পরিবহনের একটা চেহারা পাওয়া যায়। এই স্মৃতিকথাতেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ভ্রমণের কথা :

> "সেদিন কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী যাইতে হইয়াছিল ; বহুদিন পরে পদ্মার লৌহশৃঙ্খল 'হার্ডিংব্রীজ' বা 'সাঁড়ার পুল' দেখিলাম। উহার দক্ষিণ তীরে নদীয়ার ভেড়ামারা ষ্টেশন, উত্তর তীরে পাবনা জেলার পাক্সী ষ্টেশন। উভয় ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী 'ব্রীজ' পার হইতে তিন মিনিট সময় লাগিল। কিন্তু পুলের নীচে বিশালকায়া পদ্মার অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হইল। বহুদূর প্রসারিত চর স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ-জলরেখা বুকে লইয়া কঙ্কালসার মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া আছে।"

পুনশ্চ :

> "নাটোর ষ্টেশনে পৌঁছিবার পর কয়েক মিনিট পরে সিলিগুড়ির ট্রেন আসিল। রাজসাহী হইতে নাটোর পর্য্যন্ত ১৪ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে আসিয়া সর্বশরীর বেদনায় টনটন করিতেছিল।...
>
> নৈহাটীতে নামিয়া পশ্চিমের গাড়ীতে উঠিলাম। হুগলীতে ট্রেন বদল করিয়া যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহাতে রাজমহল যাওয়া যায়।"[১২]

দীনেন্দ্রকুমারের বরোদা প্রবাসকে দু'বছরব্যাপী বরোদা ভ্রমণ বললে অত্যুক্তি হয় না। এ ছাড়াও উপভোগ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত হলো :

ক. মেদিনীপুরে তিনরাত্রি : বৈশাখ ভারতবর্ষ, ১৩২৪, পৃ. ৬৯৭।

খ. পূর্ববঙ্গে এক সপ্তাহ : মানসী, ভাদ্র ১৩২১, পৃ. ৮৫ ।...ইত্যাদি ।

দীনেন্দ্রকুমারের কৌতূহলমুখর এবং স্বচ্ছ বর্ণনাসমৃদ্ধ চমৎকার প্রবহমান রচনার পরিচয় আমরা উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করতে পারি :

> "দেখলাম প্রাচীন প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা কতকালের প্রাসাদ, কে বলিবে? এই প্রাসাদ 'আবাসগড' নামে বিখ্যাত। আবাসগড়ে এখন আর কিছুই নাই, কেবল এই প্রাচীন ভগ্ন-মন্দির অতীতযুগের সাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান।...
>
> আমরা শকট যোগে কর্ণগড় অভিমুখে ধাবিত হইলাম। প্রশস্ত পথ; পথের দুই দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঁওতাল কুটীর; সাঁওতাল রমণীগণ শুষ্ক কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া নগরে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুষ্ক তৃণ, কণ্টক পূর্ণ ও অনুচ্চ ক্ষেত্র।...দক্ষিণে বামে বহুদূর বিস্তৃত শালবন। বসন্তকালে শালবৃক্ষে নব-পত্রোদ্গম হইয়াছে, দূর হইতে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল।"

কিংবা এই অংশটি :

> "সেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে শালতরুচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বহু প্রাচীন ভগ্ন ও বিধ্বস্ত রাজধানীর দিকে চাহিতে চাহিতে কত কথাই মনে আসিতে লাগিল। কত সুখ, কত ঐতিহ্য, কত আনন্দ উৎসবে এই স্থান পূর্ণ ছিল।"

দীনেন্দ্রকুমারের ধর্ম বিষয়ক রচনার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কোনো একটি ধর্ম নয়, বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কেই তাঁর সজাগ কৌতূহল ছিল। তাঁর নিজের ধর্ম বিশ্বাস কেমন ছিল? ছোটবেলা থেকেই তিনি ধর্মীয় উদারতার শিক্ষা পেয়েছিলেন।

পিতা ব্রজনাথ রায় যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা আমরা উল্লেখ করেছি। দীনেন্দ্রকুমার নিজে বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি দুর্বলতা-প্রদর্শন করেন নি। বরং ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রদায়িক বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, পরমত-অসহিষ্ণুতা, ধর্মকে বস্তুজীবনের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার ইত্যাদিকে তিনি কিছুটা তির্যক দৃষ্টিতেই অবলোকন করেছেন। মেহেরপুরের কৈশোরজীবনে তিনি তাঁর এক সহপাঠী-কর্তৃক ভণ্ড সুদখোর চরণদাস বাবাজীর নাকাল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে সেকালের স্মৃতিতে। পিতা ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও দীনেন্দ্রকুমার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তাকে কোনোমতেই অনুকূল বলা চলে না। কৃষ্ণনগরে পাঠকালে লজিকের এক

অধ্যাপকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> " ··বাবু শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি আমাদিগকে লজিক শিখাইতেন আমাদের অনেকে তাঁহার সহানুভূতি-লাভের জন্য মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতাম, এবং চক্ষু মুদিত করিয়া ভক্তি প্রকাশের অভিনয় করিতাম , মধ্যে মধ্যে তিনি সংকীর্তনের দলে যোগদান করিতেন, তখন আমরা তরুণ ভক্ত-(ভাক্ত ?) বৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতাম, উভয় বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মুখব্যাদান করিয়া গাহিতাম—
>
> "ব্রাহ্মধর্মের জয়ডঙ্কা সজোরে বাজাও।"[৪৩]

সম্ভবত হিন্দুধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ আস্থাবশত তিনি হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি 'গীতার সময়োপযোগী ব্যাখ্যা' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিছু স্ববিরোধিতা থাকলেও দীনেন্দ্রকুমারের ধর্মবোধের মূলে ছিল এক ধরনের সমাজবোধ। তাঁর এ-জাতীয় রচনার মধ্যেই এই সমাজবোধের পরিচয় মিলবে।

১. শিখ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনীতি : ভারতী, চৈত্র ১৩০১, পৃ. ৭০৭।
২. শিখ ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি : ভারতী, বৈশাখ ১৩০২, পৃ. ৩৪।
ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ. ৮৮।
ঐ, শ্রাবণ ১৩০২, পৃ. ২১৯।
ঐ, ভাদ্র ১৩০২, পৃ. ২৪৯।
ঐ, পৌষ ১৩০২, পৃ. ৪৯০।
৩. শিখ সম্প্রদায়ের অধঃপতন : ঐ, ফাল্গুন ১৩০২, পৃ. ৬১২।
৪. শিখ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা : ঐ, চৈত্র ১৩০২, পৃ. ৬৯১।
৫. মহম্মদ ও তাঁহার ধর্মমত : ঐ, শ্রাবণ ১৩০১, পৃ. ২১৮।
ঐ, ভাদ্র ১৩০১, পৃ. ২৫৭।
ঐ, আশ্বিন ১৩০১, পৃ. ৩৩৯।
৬. মহম্মদীয় নরক : সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০১, ২৬০।
ঐ, কার্তিক ১৩০১, পৃ. ৪৪১।

ইত্যাকার-রচনার সামান্য পরিচয় গ্রহণ করলেই এর উদ্দেশ্য-বিধেয় স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন : শিখ ধর্ম ও শিখ জাতি বিষয়ে তার দীর্ঘ রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়।

'শিখধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি' রচনায় একাধারে দীনেন্দ্রকুমারের ইতিহাসবোধ, সমাজচেতনা, তাঁর জ্ঞান ও পাঠের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ ও রচনার সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন :

ক. ম্যালকম্ স্কেচ অব শিখস্।

খ. ফরস্টার'স্ নভেল-১।

গ. শের্-উল-মুতাখ্রিন (বিগ্'স্ ট্রানস্লেশন)।

ঘ. দেবীস্তান।

ঙ. হিউজেল'স্ ট্র্যাভেলস্।

চ. ওয়ার্ড অব্ দি হিন্দুস্।

ছ. ড. ম্যাক্গ্রেগর'স্ হিস্টরি অব দি শিখস্।

জ. কানিঙ্হাম'স্ হিস্টরি অব দি শিখস্।

ঝ. এশিয়াটিক রিসার্চে'স্।

ঞ. মেমোরিজ অব জাহাঙ্গীর।

ট. গিবন'স্ হিস্টরি।

ঠ. গিবনস্' ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান্ এম্পায়ার।

ড. টড'স্ রজস্থান।

এই প্রবন্ধে দীনেন্দ্রকুমার শিখগুরু পরম্পরায় শিখধর্মের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শিখগুরুরা হলেন : নানক ছাড়াও—গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস, গুরু রামদাস, হরগোবিন্দ, গুরু হররায়, গুরু হরিকিষেণ, গুরু তেগবাহাদুর, গুরু গোবিন্দ সিংহ। গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুতে শিখ-সম্প্রদায়ের অধঃপতন লক্ষ্য করে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

> "কিন্তু এজন্য আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্টি যেদিন অর্ধপৃথিবী জয় করিয়া ফরাসী ভূমিকে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অদ্বিতীয়া রাজেন্দ্রাণীর আসন প্রদান করেন, সেদিন কে জানিত সেণ্ট হেলেনার পাষাণ কারাগারের স্তব্ধ প্রাচীরের মধ্যে তাঁহার সঙ্গীহীন…জীবন অবসানই বিধিলিপি।……
>
> যৎকালে মহম্মদ মক্কা নগর হইতে পলায়ন করেন তৎকালে হয়ত "একজন সামান্য আরববাসীর বর্ষা [বর্শা] আঘাতেই জগতের ইতিহাসের রূপান্তর ঘটিতে পারিত।"

উদ্ধৃত অংশে পাঠ-ব্যাপকতা ও সাহিত্য-রসসিক্ততা লক্ষণীয় মাত্রায় ধরা পড়েছে।

দীনেন্দ্রকুমারের এ-জাতীয় রচনা-সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ জরুরি, তা' হলো : বাহ্যত ধর্ম-বিষয়ক হলেও ইতিহাসচেতনা এবং সমাজবিজ্ঞান এর অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত। ধর্মীয় আবেগ নয়—জ্ঞানচর্চাই এই সমস্ত রচনার মূল উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী লগ্ন হয়ে আছে সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের বোধ এবং লেখককৃত সমাজ-ইতিহাসের ব্যাখ্যা।

এ কারণেই লৌকিক ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও একইভাবে দীনেন্দ্রকুমারের মধ্যে জাগরূক দেখতে পাই। 'সেকালের স্মৃতি'তে এবং কয়েকটি টুকরো নিবন্ধে তিনি নদীয়া জেলায় প্রচলিত লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের কথা সযত্নে তুলে এনেছেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

দীনেন্দ্রকুমারের গল্পের জগৎ

বহুপ্রসূ দীনেন্দ্রকুমার রচিত গল্পভাণ্ডারটি বেশ স্ফীত। সমস্ত জীবন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর গল্প লিখেছেন তিনি। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভাণ্ডারটির সামগ্রিক পরিচয়গ্রহণ সম্ভব নয়।

তার গল্পসাহিত্যের মধ্যে কোনো পাঠক যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা বৃহৎকথা বৃহৎভাব আশা করেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হবে। দীনেন্দ্রকুমারের গল্পে আছে সাধারণ মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালো-মন্দ এবং সঙ্গতি-অসঙ্গতির কথা। সবার উপরে তাঁর গল্পে পাওয়া যাবে বাসনা-বেদনাখিন্ন মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি সকরুণ সহানুভূতি। এই মধ্যবিত্ত বাঙালি ঊনবিংশ শতকের শহুরে মধ্যবিত্ত নয়, বহুলাংশে সামন্ত-বঙ্গের গ্রামীণ মানুষ। এমনই গল্প : অনাথা (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ. ৬৭), চাকুরে ভাই (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২২, পৃ. ৩৯৭), হেড্‌মাস্টার (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ. ২০৮), ভেকধারিণী (সাহিত্য, মাঘ ১৩২৩, পৃ. ৬৫৯), নূতন সংসার (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩১৩, পৃ. ৭৩২) কলাহার (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ. ৭৩), কলির ধর্ম্ম (মানসী ও মর্ম্মবাণী, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ. ৬২৭), পঞ্চমপক্ষ (মানসী, আশ্বিন ১৩২২, পৃ. ১৮৯) ইত্যাদি।

দীনেন্দ্রকুমারের গল্পে স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবনের ছবি যেমন আছে, তেমন আছে একান্নবর্তী পরিবারের কথা, তার ভাঙনের ছবি, আবার তার গল্পে তেমনি পাওয়া যাবে ব্যক্তি ও সমাজের অসঙ্গতির প্রতি কৌতুক ও ব্যঙ্গের খোঁচা। এই ব্যঙ্গ প্রাসঙ্গিক ও শাণিত। 'জামাইবাবু' (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২২) গল্পের শেষে

ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে পদ ও উপাধি-প্রাপ্তির জন্য একশ্রেণীর মানুষের লোভ ও নির্লজ্জতার কথা বলা হয়েছে। এ-জাতীয় ব্যঙ্গে কাঁটার জ্বালাও কম ছিল না। ফলে তাঁর কোনো কোনো গল্পের রঙ্গব্যঙ্গ নিয়ে কখনও কখনও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতা' (বৈশাখ ১৩১৯, পৃ. ১৬) গল্প নিয়ে এমনই বিতর্কের সংবাদ আমরা পাচ্ছি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের একটি নোট থেকে :

> "আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, গত বৈশাখের সাহিত্যে প্রকাশিত 'ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতা' নামক হৃদয়গ্রাহী পল্লী কথানকটি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের ও সমালোচকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলেও, তাহা পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠক লেখকের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, ঐ গল্পে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। এমন কি কোনও মফস্বল কোর্টের কোনও কোনও আনকাওয়াস্তে উকীল মহামহিম হাকিম মহাশয়ের এজলাসে গল্পটির সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের হুজুরকে জানাইয়াছিলেন, এই গল্পে তাঁহাকে অত্যন্ত অভদ্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে! মফস্বলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধর্ম্মাবতার—বাহাল-বরতরফের কর্ত্তা হাকিমদের লইয়া কাগজে-কলমে ঠাট্টা! ধর্ম্মাবতার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। আশঙ্কার কথা বটে! উক্ত গল্পে কোনও কাল্পনিক মহকুমার দেশীয় হাকিমদের ব্যবহার-প্রসঙ্গে যে দুই-একটি কথা বহস্যচ্ছলে নিতান্ত সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে হাকিম বিশেষের গাত্রদাহের কারণ কি? দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'তে ঘটিরামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই চিত্র যে সর্ব্বাংশে কাল্পনিক, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সেইজন্য কি কোনও ঘটিরাম এজলাসে বসিয়া দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া স্বীয় "ঘটিরামত্ব" প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন! হাস্যরসিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত-ফের্ত্তাদের বিদ্রূপ করিয়া হাসির গান রচিয়াছেন, সেজন্য কি "বিলাত-ফের্ত্তা ক'ভাই" তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছেন? মনুষ্যচরিত্রের চিত্রাঙ্কণে মনুষ্য ভিন্ন পশুর আদর্শ গ্রহণ করিবার উপায় নাই; কিন্তু কোনও রচনায় যদি সম্প্রদায় বিশেষের কোনো খেয়ালের প্রতি ইঙ্গিত থাকে, টুপী যদি ব্যক্তিবিশেষের মাথায় মানানসই হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা নাচার।"[৪৪]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই সম্পাদকীয় মন্তব্য জব্বর-জবাব সন্দেহ নেই।

দীনেন্দ্রকুমারের একেবারে ভিন্ন স্বাদের আখ্যানমূলক গল্পও আছে। 'ভ্রম-সংশোধন' (মানসী, আশ্বিন ১৩২১, পৃ. ১৯২) এই জাতীয় গল্প।

মজার কথা (১৩০৩) এবং ঢেঁকির কীর্তি (১৩৩১) তাঁর গল্প-সংগ্রহ। প্রথমটি আখ্যানজাতীয় এবং তরুণপাঠ্য রচনা। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি লেখক কর্তৃক সংগৃহীতও বলা যায়—জাতে রূপকথা বা উপকথার আদল আছে। সমকালে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :

> "বালকদিগের চিত্তবিনোদনোদ্দিষ্ট 'Fairy Tales' নামধেয় অনেকগুলি পুস্তক ইংরেজিতে আছে—ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই আছে। এই পুস্তকের গল্পগুলি প্রধানত এই সকল পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। কেবল দুইটি গল্প—'মূর্খ পণ্ডিত', ও 'ভূতের বোঝা'—কোন বৈদেশিক সাহিত্য হইতে গৃহীত নহে।……
>
> পুস্তকখানির সম্বন্ধে ব'লতেছি, ভাল হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। ইহা মুখ্যত বালকদিগের জন্য লিখিত, কিন্তু শুধু বালক কেন, বালকদিগের পিতামহ-মাতামহেরা পর্যন্ত ইহা পড়িয়া আমোদিত হইবেন—অন্তত আমরা হইয়াছি।"[৪৫]

অপরদিকে ঢেঁকির কীর্তিকে সচিত্র গল্পসমষ্টি বলা চলে। গ্রন্থে ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে। সমকালীন পত্রিকায় গ্রন্থটির প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল :

> "গল্পগুলি অধিকাংশ সত্যঘটনামূলক। তদুপরি গল্পচিত্রে সিদ্ধহস্ত দীনেন্দ্র রায়ের লেখনীর গুণে গল্পগুলির মধ্যে সেকালের পল্লীজীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দীনেন্দ্রবাবু এবার এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাহার এক পুস্তকে ছেলে ও বুড়ো সকলেরই আনন্দলাভের ব্যবস্থা আছে।"[৪৬]

রাজসাহী বাসকালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বাসন্তী'র কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর আরেকটি গল্প সংকলন 'দেবতার ভবে'র গল্পগুলি মেহেরপুরের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অবশ্যই গল্পকার দীনেন্দ্রকুমারের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করা যাবে না। একটি কথা আমরা মনে রাখব যে, উৎকৃষ্ট গল্প রচনার জন্য সেকালের সম্মানজনক পুরস্কার 'কুন্তলীন' পুরস্কার তিনি লাভ করেছিলেন—একবার নয় একাধিকবার। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে লাভ করেছিলেন দ্বিতীয় পুরস্কার 'পূজার বাজার' গল্পটির জন্য। ১৩০৫ সনে লাভ করেন প্রথম পুরস্কার 'বিধবা'

গল্পের জন্য। পরের বছর ১৩০৬ বঙ্গাব্দে আবার হাস্যরসাত্মক অনবদ্য গল্প 'অদলবদলের' জন্য তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পান। একদা কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প নির্বাচনও করে দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার।

তাঁর গল্পে শাণিত ব্যঙ্গের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। নক্‌শা জাতীয় রচনায় দীনেন্দ্রকুমারের এই ক্ষমতা আরও সপ্রমাণিত। সাধারণ বাঙালির জীবনকে তিনি এত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, মনুষ্যচরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিগুলিকে তিনি সহজেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এই অসঙ্গতি-দর্শন থেকেই মুখ্যত তাঁর রঙ্গব্যঙ্গমূলক নক্‌শাজাতীয় রচনার জন্ম। তাঁর নক্‌শার লক্ষ্য গ্রামের পণ্ডিতমশাই থেকে কেরানী, নাজীর থেকে হাকিম পর্যন্ত। তিনি তাঁর রসবোধ নিয়ে গ্রামের পাঠশালা থেকে বিবাহবাসর, বিবাহবাসর থেকে আদালত পর্যন্ত পরিক্রমা করেছেন। কখনও তাঁর বিদ্রূপ অঙ্কুশের মতো জ্বালাময়, কখনও মানুষের আচরণের তুচ্ছতায় ম্লান, কখনও-বা নিরুপায়-অসহায়তার কারুণ্যে বিষণ্ণ। গ্রাম্য দলাদলি (সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ. ৩৪৭), ভূতের দেশত্যাগ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২১, পৃ. ২৭৭), প্রজাপতির নির্বন্ধ (সাহিত্য, চৈত্র ১৩২১, পৃ ৮৯৭), গদাই পণ্ডিত (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, পৃ. ৮৫৯), সেকালের ডেপুটী (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২২, পৃ. ৭২), পাদুকা-রহস্য (ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৩, পৃ ২৯৯), ল্যাংড়ার কলমে আমড়া (বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, পৃ ২১৮) ইত্যাদি রচনার মধ্যে যদি আমরা শেষোক্ত রচনাটির কথাই ধরি তাহলে দেখতে পাবো যে, নক্‌শামূলক গল্পে বাস্তব পটভূমির বাইরে যাওয়ার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। 'ল্যাংড়ার কলমে আমড়া' হলো স্বনামধন্য (!) লালগোপাল খাঁজা এবং তার দত্তক-পুত্র নৃত্যগোপাল খাঁজার বড়লোকি এবং কৃপণতার উপভোগ্য কাহিনী।

গো য়ে ন্দা গ ল্প ও কা হি নী

দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্য জীবনের জনপ্রিয়তা ও অখ্যাতি নির্ভর করছে তাঁর বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দাকাহিনী ও রহস্য উপন্যাসের উপর। সাময়িকপত্রের পাতায় রহস্য-রোমাঞ্চযুক্ত বহু রচনা ছাড়াও একদা তিনি রহস্যকাহিনীর রচয়িতা হিসেবেই বাঙালি পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 'নন্দনকানন' ও 'রহস্যলহরী' সিরিজে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর এজাতীয় উপন্যাসের সঠিক সংখ্যা কত ? বারিদবরণ ঘোষ লিখেছেন :

"...তিনি সূত্রপাত করেন 'নন্দন-কানন' সিরিজ। এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'রহস্যলহরী' সিরিজ। 'রহস্য-লহরী' সিবিজের ২১৭ খানি পুস্তকের সঙ্গে নন্দনকানন সিবিজের বইগুলি একত্র করলে দীনেন্দ্রকুমারের ডিটেক্‌টিভ ধরনের অনুবাদ-মূলক সস্তা গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় অর্ধসহস্র। সেদিক থেকে তাকে রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের প্রায় কারখানার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পাবে।"[৪৭]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও 'সা'হত্যসাধক চরিতমালা'য় রহস্য-লহরী সিরিজের ২১৭টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাব মৃত্যুর পর বেরোয় এই সিরিজের ২১৮ সংখ্যক গ্রন্থটি।[৪৭ক] এহ্‌বাহ্য: তাঁর এজাতীয় গ্রন্থের স খ্যা পাঁচশোই হবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কার্যকালে বসুমতীর সম্পাদকীয় কার্যালয় থেকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রকাশিত 'নন্দনকানন' পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে গিয়ে এর প্রথম সংখ্যার (ফাল্গুন ১৩০৭) সম্পাদকীয়তে দীনেন্দ্রকুমার লেখেন :

"বঙ্গদেশে এখন মাসিক পত্রিকার অভাব নাই, বঙ্গদর্শনের যুগের সহিত তুলনা কবিলে, সেকালে আর একালে কি প্রভেদ! এখন সহরে মফস্বলে সর্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাশ্রেণীর পত্রিকার অস্তিত্ব বর্তমান দেখা যায়, কিন্তু একথা বোধকরি কেহই অস্বীকার করিতে পারিতেন না যে, ইংল্যাণ্ডের Monthly magagine of fiction প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী সুন্দর গল্পপূর্ণ মাসিক পত্রিকার এদেশে প্রচলন হয় নাই;... সেই অভাব দূব করিবার জন্য, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে, অভিনব শতাব্দীর আবির্ভাবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা 'নন্দনকানন' প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। · ১লা জানুয়ারি, ১৯০১ সাল।"

নন্দনকাননে প্রচুর রহস্য রচনা প্রকাশ করেও তৃপ্ত হন নি তিনি, নিজেই সূচনা করেন 'রহস্য-লহরী'র। এই সিরিজের উপন্যাসগুলির আখ্যাপত্রে প্রথম দিকে লেখা থাকত 'দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত', পরে সম্পাদিতর জায়গায় মুদ্রিত হতো প্রণীত।

রহস্য-লহরীর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দে। উপন্যাসটির নাম ছিল 'বিধির বিধান'। এর পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অবিরল রহস্য-লহরীর রহস্যোপন্যাসগুলি রচনা করে গেছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এড্‌গার-এলান-পো (১৮০৯-৪৯) তাঁর ডিটেক্‌টিভ রচনা নিয়ে বিশ্বজয়ে নামেন। রহস্য-গল্পের জনক হিসাবে পো বন্দিত হন। তাঁর রচনায় রহস্য-রোমাঞ্চ, আলৌকিকত্ব, ভৌতিক ও ভীতি-উদ্দীপক বিষয় যুক্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় গোয়েন্দা-গল্পের অবিস্মরণীয় নায়ক শার্লক হোমস্‌ এসেছেন আরও পরে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে।

বাঙলা ভাষায় গোয়েন্দা গল্পরচনার পথিকৃতের কৃতিত্ব অবশ্য দীনেন্দ্রকুমারের নয়। বাঙলা গোয়েন্দা গল্পের পথিকৃৎ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। পেশায় ছিলেন পুলিশ কর্মচারী। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নাম দিয়ে একটি পত্রিকা চালিয়ে ছিলেন ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে প্রায় বারো বছর। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ পরে 'ডিটেক্‌টিভ গল্প' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। দারোগার দপ্তর অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

তবে বাঙলা গোয়েন্দা কাহিনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫)। ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিত্তশালী হতে পেরেছিলেন। তাঁর 'নীলবসনা সুন্দরী', 'মায়াবী', 'মনোরমা', 'হরতনের নওলা', 'হত্যাকারী কে' ইত্যাদি গ্রন্থ বিরাট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থ। দীনেন্দ্রকুমারের রহস্য-লহরীর উপন্যাসগুলি জনপ্রিয় হলেও পাঁচকড়ি দে'র পাঠকবাজারকে অতিক্রম করতে পারে নি। তবু আলোচকেরা দীনেন্দ্রকুমারের এ-ধরনের রচনা সম্পর্কে যা লিখেছেন তার মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে :

> "এখন যাঁরা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নাম শ্রুত আছেন তাঁরা জানেন তাঁকে রহস্যলহরী সিরিজের গ্রন্থকর্তারূপে মিস্টার রবার্ট ব্লেকের স্রষ্টা (!)। কেউ কেউ হয়ত তাঁকে 'মেয়ে-বোম্বেটে', 'জাল মোহান্ত' অথবা 'পিশাচ পুরোহিত' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক (বা অনুবাদকরূপে) জানেন। 'রূপসী মরুবাসিনী' নামটি হয়ত কারও স্মৃতিতে ঢেউ তুলতে পারে।"
>
> —সুকুমার সেন।

কিংবা :

> "সন্দেহ নেই, লঘুস্বাদ এই রহস্য-রচনাবলী একদা তাঁকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, তাঁর 'রূপসী বোম্বেটে' পড়েন নি এমন পাঠকও সমকালে বিরল…।"—'সেকালের স্মৃতি'-র প্রকাশকের নিবেদন-অংশ।

পুনশ্চ :

"দীনেন্দ্রকুমারের লেখনী শ্রান্তি অনুভব করেনি কখনও। তাঁর 'রূপসী বোম্বেটে'র সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, তৎকালীন এমন পাঠকের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্বগণ্য।"[৭৮]

—আমরা যদি ঠিক এই দৃষ্টিতে না দেখে দীনেন্দ্রকুমারের রহস্যরচনাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখি তাহলে অদৃষ্টপূর্ব আলোকপাত ঘটবে দীনেন্দ্রকুমারের রহস্যরচনার উপর !

একথা ঠিকই যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীনেন্দ্রকুমার এক বৃহৎসংখ্যক বাঙালি পাঠকের কাছে ডিটেক্‌টিভ গল্পলেখক বা মিস্টার রবার্ট ব্লেকের স্রষ্টা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যদি ভেবে দেখি যে, দীনেন্দ্রকুমারের মতো প্রবল সাহিত্য-রসবোধসম্পন্ন বহুমুখী লেখনশক্তির অধিকারী এবং সাহিত্যের জন্য নিবেদিত-প্রাণ একজন লেখক—যিনি কিনা রুচি ও আভিজাত্যের জন্য তৎকালে সাহিত্য-সংসারে দুটি সুপরিচিত পত্রিকা 'সাহিত্য' ও 'ভারতী'র নিয়মিত লেখক—তিনি কেন লঘু ও সস্তা রচনাকে এতটা প্রশ্রয় দিলেন? সে কি শুধুমাত্র অর্থলাভের আশায়? এর নানা কারণ থাকতেই পারে কিন্তু এই জাতীয় অনুবাদের প্রাচুর্যের কোনো ব্যাখ্যা দীনেন্দ্রকুমারের কাছে ছিল? সম্ভবত ছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন :

"ভারতে 'পল মাইনস' নাই, এবং এদেশে এরূপ উপন্যাসের কার্যক্ষেত্রও নাই; এজন্য ভারতীয় সাহিত্যে এই শ্রেণীর মৌলিক উপন্যাস রচিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে 'গোয়েন্দার দপ্তরে'র যুগ বহুযুগ পূর্বে অতীত হইয়াছে, কলুষিত প্রণয়ের হলাহল-জর্জরিত দেশী গোয়েন্দার কাহিনীর স্থান নবীন ভারতে নাই।"[৪৯]

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকে অনুবাদের কারণ আর রুচিশীল রহস্যকাহিনী পরিবেশনে দীনেন্দ্রকুমারের প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে। 'রহস্য-লহরী'র উদ্দেশ্য তাঁর কাছে : আপামর বাঙালি পাঠকের জন্য নির্দোষ আমোদ ও মনোরঞ্জনের উপকরণ পরিবেশন।

এই বিপুল-সংখ্যক রহস্য-রোমাঞ্চ গ্রন্থরাজির তুচ্ছতা-বিষয়ে তাঁর কি কোনোই সচেতনতা ছিল না? বিশেষভাবে আবাল্য যিনি সাহিত্যের জন্য, সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁর? ছিল। সেকালের এবং বলাইবাহুল্য একালেরও তথাকথিত শিক্ষিত পাঠক এবং আজ আমরা যেভাবে এগুলি তুচ্ছ ভাবছি—

ব্যাপক ও বৃহত্তর পাঠকসমাজের দিকে তাকিয়ে দীনেন্দ্রকুমার তাকে অতটা তুচ্ছ ভাবতে পারের নি। বিদেশে রহস্য-লহরীর আদরের এক দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন :

"সসাগরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবস্বরূপ, লণ্ডনস্থ ব্রিটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরার মহামান্য কর্তৃপক্ষ রহস্য-লহরী উপন্যাসমালা তাঁহাদের বিশ্ব-বিশ্রুত মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের যোগ্য মনে করিয়াছেন। এই দুর্লভ সম্মানে বহস্যলহরা গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে একটা গ্রাম্য প্রবচন প্রচালত আছে, "গেঁয়ে যোগী ভিক পায় না।" সুদূর শ্বেতদ্বীপের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থাগারে যাহা সংরক্ষণের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের স্বদেশে অনেক সাহিত্যরসজ্ঞ শিক্ষিত পাঠকের পুস্তকালয়ে স্থানলাভ করিতে পাবে নাই।...জানি না কেহ ইহাকে অপাঠ্য 'রাবিশ' মাত্র মনে করেন কিনা।.. "[৫০]

সংখ্যায় বিপুল হলেও দীনেন্দ্রকুমার রহস্যকাহিনী রচনা বা অনুবাদের সময় সম্ভবত কখনই তাঁব সমাজবোধের কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হন নি। তাই তার রহস্য উপন্যাসে, এমন কি যে উপন্যাসের প্রধান চবিত্র রূপসী বোম্বেটে বা এমেলিয়া কার্টার বা মায়াবিনী কোনো নারী, সেখানেও সংযম বা শালীনতা বজায় আছে দারুণভাবে। রহস্য-লহবীর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায়, নিবেদনে বা গ্রন্থকারের বক্তব্যে মূল্যবান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গও উঠে এসেছে বারংবার। যা থেকে চলমান সমকালের কিছু পরিচয় আমরা লাভ করি—ছাপার কাগজের মূল্যবৃদ্ধি, ডাকমাশুল বৃদ্ধি ইত্যাদিতে সাহিত্যজগতে ক্ষোভকে অকপটে প্রকাশ করেছেন দীনেন্দ্রকুমার।[৫১] রাজনৈতিক বিষয়েও কিছু মন্তব্য এভাবে আমরা পেয়ে যাই : 'চীনের চক্র'[৫২] উপন্যাসের নিবেদন অংশে নবজাগ্রত চীন নিযে আশাবাদী মন্তব্য করেছেন দীনেন্দ্রকুমার। সাম্রাজ্যবাদী চক্র পরিচালিত চীনে আফিমযুদ্ধের তীব্র নিন্দাও করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি-সম্পর্কে সচেতন দীনেন্দ্রকুমার কখনও কখনও পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলির অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী-কালে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বিভ্রান্ত দীনেন্দ্রকুমার কোথাও কোথাও বলশেভিকদের প্রতি বিনিপাত করেছেন।[৫৩] অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মন্তব্যের উৎস রয়টার প্রেরিত সংবাদ। অবশ্য এখানেও দীনেন্দ্রকুমার প্রথমে সুচারুভাবে বলশেভিক কারা ও বলশেভিকতন্ত্র কি—তা' ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক

ধনবণ্টনের সুষমতার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। বল ও শক্তির রাজনীতির বিরোধিতাও তিনি করে গেছেন।

সুতরাং, তুচ্ছতার দায়ে অভিযুক্ত দীনেন্দ্রকুমারের রহস্য-লহরী সিরিজের সমস্ত রচনাই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এই সিরিজ চালাতে গিয়ে প্রথম দিকে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন :

> " রহস্যলহরীর জন্য আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু আমরা বিপন্ন হইব, ইহা বিশ্বাস করি না। রহস্যলহরীর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণ…প্রায় সকলেই রহস্যলহরীকে স্নেহ করেন।"[৫৪]

রহস্যলহরীর জন্য দীনেন্দ্রকুমার কাদের স্নেহ ও সমর্থন পেয়েছিলেন? বাংলা ও বাংলার বাইরের দেশীয় রাজা ও জমিদারবর্গ ছিলেন রহস্যলহরীর হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক। এঁদের সমর্থনের আকার-প্রকার কেমন ছিল, তা অবশ্য আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রহস্যলহরীর বিভিন্ন উপন্যাস উৎসর্গ করা হয়েছে এই সমস্ত ভূম্যাধিকারীর নামে :

"রহস্যলহরীর চিরশুভাকাঙ্ক্ষী পৃষ্ঠপোষক
ময়মনসিংহ-কালীপুরের
উদারচেতা-বহুগুণান্বিত
ভূম্যাধিকারী
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার লাহিড়ী-চৌধুরী
মহাশয়ের করকমলে
আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
অর্পিত হইল।"

[রহস্যলহরীর ৫৭নং গ্রন্থ : 'যখের আসন', ভাদ্র ১৩২৮-এর উৎসর্গপত্র]।

এইভাবে ক্ষীরোদনাথ চৌধুরী (তস্কর তনয়া, ৪৯নং গ্রন্থ), মছনদ আলী দেওয়ান আলীমদাদ খান (রূপসী বোম্বেটে, ৩নং গ্রন্থ, ফাল্গুন ১৩২০), রঙ্গপুর গোপালপুরের জমিদার ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (চূড়ান্ত চাতুরী, ২০নং গ্রন্থ), মহিষাদলাধি-রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর (নাবিকবধু, ২৫নং গ্রন্থ, ১৩২৪) ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন ভূস্বামীকে একাধিক গ্রন্থ উৎসর্গ করার উদাহরণও আছে, যেমন: 'শিয়াড়সোল রাজবংশের অলঙ্কার' প্রথমনাথ মালিয়া বাহাদুর (চীনের চক্র, ৪২নং গ্রন্থ এবং বন্দিনী রাজনন্দিনী, ১০৮নং গ্রন্থ, পৌষ ১৩৩৩)।

রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস দীনেন্দ্রকুমারকে যতটা জনপ্রিয়তা দিয়েছিল, ততটা অর্থ এনে দেয় নি, অথচ এ ধরনের রচনা প্রধানত বিত্তের পশ্চাতে ধাবমান বলে নিন্দিত। রহস্যলহরীর প্রথম ১০৭টি গ্রন্থ কলকাতার সাধারণ প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল, ১০৮নং গ্রন্থ 'বন্দিনী রাজনন্দিনী' থেকে নিজস্ব বৈদ্যুতিক মেসিন প্রেসে ছাপা হতে থাকে রহস্যলহরী। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার-পুত্র দীব্যেন্দ্রকুমার রায়, প্রেসের ঠিকানা ছিল : ২এ অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা। রহস্যলহরীর কার্যালয় হিসেবে মেহেরপুর, নদীয়ার ঠিকানা দেওয়া থাকত।

পাঠকের মনোরঞ্জন ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য রহস্যলহরীর পুস্তকগুলিকে সচিত্র করা হয়েছিল। ১১৫নং গ্রন্থটি চিত্রশোভিত হয়ে বেরোন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :

> "ইহার এবং রহস্যলহরীর অন্যান্য চিত্র কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র শ্রীমান বলেন্দ্রকুমার রায়ের অঙ্কিত। এই তরুণ শিল্পী তাঁহার পিতার সম্পাদিত 'রহস্য-লহরী'কে চিত্রসম্পদে ভূষিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন।"[৫৫]

শুধুমাত্র ইউরোপীয় রহস্যোপন্যাসের অনুবাদ-অনুসরণ নয়, দীনেন্দ্রকুমার ইউরোপে-প্রচলিত সিরিজ-উপন্যাসের বাণিজ্যিক শিষ্টাচারকেও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন : উৎসবের ডবল নম্বর, শারদ উপহার ইত্যাদি। অতি আশ্চর্যের কথা : তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'পল্লীকথা' রহস্যলহরী সিরিজের শারদ উপহার-হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তথাকথিত অভিজাত ও উন্নাসিক পাঠকেরা দীনেন্দ্রকুমারের রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় উপন্যাসকে অবজ্ঞা করলেও সেকালের নামকরা পত্রিকাগুলি 'সাহিত্য-সংবাদ' বা 'সাহিত্য-পরিক্রমা'য় প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে গেছে এ জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ সংবাদ। আমরা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা থেকে এমন কিছু গ্রন্থ-প্রকাশনা সংবাদ উদ্ধার করতে পারি :

> ক. "শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "কমলে কণ্টক" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা। কাঁটা হেরি কেহ যেন কমল তুলিতে ক্ষান্ত হইবেন না, আশা করি।" (সাহিত্য সংবাদ, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃ. ১৪৪)।
>
> খ. "ইংরেজী উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "বালিনের বন্দী"কে খালাস করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। এগার আনা ব্যয় করিলেই তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে।" (তদেব, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ. ৩২০)।

গ. "শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় এবার "সাংঘাতিক উইলে"র 'প্রবেট' লইয়া এগার আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। আবার কেহ 'কোডাসিল' বাহির করিবেন না ত ?" (তদেব, পৌষ ১৩২৩, পৃ. ১৫২)।

ঘ. "শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় 'রহস্যলহরী'র লীলাচ্ছলে 'এবার রোজার ঘাড়ে ভূত' চাপাইয়াছেন। ভূত নামাইতে হইলে এগার আনা দক্ষিণে লাগিবে।" (তদেব, মাঘ ১৩২৩, পৃ. ৩০৪)।

ঙ. "শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নূতন উপন্যাস "মার্কিন বণিকরাজ" এই মাসেই প্রকাশিত হইবে। মূল্য বার আনা।" (তদেব, চৈত্র ১৩২৩, পৃ. ৬০৮)।

শুধু রহস্য-লহরী বা নন্দনকানন সিরিজ নয়, 'অজয় সিংহের কুঠী' দিয়ে তাঁর হাতে রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের এবং এ-জাতীয় অনুবাদমূলক গ্রন্থের সূত্রপাত হয়েছিল, তৎকালে 'ভারতী' পত্রিকার পাতাতেও তিনি লিখেছেন এ জাতীয় লেখা। এই সূত্রেই উল্লেখনীয় কয়েকটি রহস্য-গল্পের সংকলন 'পট' (১ বৈশাখ ১৩০৮ : প্রকাশকাল)। গ্রন্থটি 'সুহৃদাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়'-কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। 'চীনের ড্রাগন' আর একটি ডিটেকটিভ গল্পগ্রন্থ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'দীনেন্দ্রকুমার রায় গ্রন্থাবলী'র দুটি খণ্ডও রহস্য গল্পের ও উপন্যাসের সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়। বসুমতী পত্রিকাতেও তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন কয়েকটি রহস্য-উপন্যাস, যেমন : 'প্রেতপুরী', 'কথাশিল্পীর হত্যারহস্য' ইত্যাদি। আর. এইচ শ্রীমানী এণ্ড সন্স প্রকাশিত 'সোনার পাহাড়' যদিও একাধারে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উপন্যাস এবং আমেরিকার দুর্গম প্রদেশের অপরিজ্ঞাত অংশের আবিষ্কার কাহিনী, তথাপি এটিকেও রহস্যকাহিনী বলা যায়।

লেখার গুণ এবং রুচিবোধের জন্য অন্যান্য রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের মতো দীনেন্দ্রকুমারের রবার্ট ব্লেক কাহিনী কখনই সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও দীনেন্দ্রকুমারের কিছু কিছু রহস্যোপন্যাসের নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হতে আমরা দেখি :

গোয়েন্দা সম্রাট রবার্ট ব্লেক। গ্রন্থপ্রকাশ

ছায়ামূর্তি। পত্রলেখা

ডাক্তারের পায়ে বেড়ী। ডি. এম. লাইব্রেরী

যথের আসন। শৈব্যা
পেয়ালার প্রলয়। বসুমতী
ভয়ঙ্কর কুয়াশা দ্বীপ। নির্মল বুক এজেন্সী
মহাসংকটে রবার্ট ব্লেক। নির্মল বুক এজেন্সী
রণস্থল মারোয়াড। গ্রন্থপ্রকাশ
রবার্ট ব্লেক রহস্য অমনিবাস। গ্রন্থপ্রকাশ
রবার্ট ব্লেকের সংকট। নির্মল বুক এজেন্সী
রহস্য অমনিবাস। গ্রন্থপ্রকাশ
রহস্যভেদী রবার্ট ব্লেক। নির্মল বুক এজেন্সী
সাদা ঠগী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির
কালো বিড়াল। ক্যালকাটা পাবলিশার্স
রূপসীর নিষ্কৃতি। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
রূপসী বন্দিনী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স দীনেন্দ্রকুমারের আরও কিছু রহস্যোপন্যাস পুনর্মুদ্রিত করেছে। গ্রন্থ প্রকাশ সংস্থা প্রকাশিত রবার্ট ব্লেক অমনিবাসের (এতে দুটি লেখা স্থান পেয়েছে: তস্কর তনয়া ও রাজা বোম্বেটে) মুখবন্ধে একালের রহস্যোপন্যাস লেখক অদ্রীশ বর্ধন লিখেছেন:

> "···ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক এককালে বঙ্গসাহিত্যে অনন্য ছিল রহস্য কাহিনীপ্রিয়দের চিত্তবিনোদনে। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'রহস্য-লহরী' উপন্যাসমালার প্রতি উপন্যাস গোগ্রাসে যারা গিলেছে পাঠ্যপুস্তক ছড়িয়ে রেখে, এই অধম তাদের অন্যতম। এই উপন্যাসমালার একটি উপন্যাসের হীরকজয়ন্তী প্রকাশ এবং আর একটির সুবর্ণজয়ন্তী প্রকাশ ঘটল বর্তমান রবার্ট ব্লেক অমনিবাসে। ব্লেক সিরিজের পুনর্মুদ্রণ এদেশেই নয়, বৃটেনেও হচ্ছে অমনিবাস আকারে। আজ থেকে ষাট বছর এবং তিপ্পান্ন বছর! আগে অনূদিত গোয়েন্দা উপন্যাসের ভাষা, কাহিনী-পরিকল্পনা, উৎকণ্ঠা-বিস্তার, শ্বাসরোধী ঘটনা-পরম্পরা এবং অনুবাদস্বচ্ছতা কি ধরনের ছিল, এবং বর্তমানে অনূদিত রহস্য উপন্যাসগুলি কি ধরনের হচ্ছে—তুলনামূলক বিচারের এই উপকরণ হিসাবেও বর্তমান অমনিবাসটি রহস্যরস-পিপাসু পাঠক-পাঠিকা এবং অনুসন্ধিৎসু সমালোচকের কাছে আদৃত হবে, এমনি আশা করা যাচ্ছে।"

একালের লেখকের উপরোক্ত মূল্যায়ন নিশ্চয়ই লঘু রচনার প্রাবল্যের মধ্যে দীনেন্দ্রকুমারের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান বলে বিবেচিত হবে।

দীনেন্দ্রকুমারের এই রহস্যের জগৎটি আরও বড়ো। মুখ্যত অনুবাদের মাধ্যমে হলেও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন একগুচ্ছ দেশী-বিদেশী শিকার কাহিনী, অলৌকিক সত্যকাহিনী ইত্যাদি বহুতর বিচিত্রস্বাদের রচনা। এই সমস্ত রচনায় রয়েছে—ভৌতিক, অতিলৌকিক, অবিশ্বাস্য নানান উপাদান। বস্তুতপক্ষে, এগুলিকে সহজেই সাময়িকপত্রের জঠরপূর্তি-প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এবং সম্ভবত এই কারণে সাময়িকপত্রের পাতা থেকে এগুলি গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কেউ এ-যাবৎ উৎসাহ বোধ করেন নি।

কোনো সন্দেহ নেই যে, রহস্য উপন্যাসের লেখক বা অনুবাদক হিসেবের আনুকূল্য পেলেও সমকালে এবং পরেও অভিজাত পাঠক সমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা লাভ করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার। বিশেষভাবে এই জাতীয় রচনার সংখ্যাধিক্য তাঁর সাহিত্য-খ্যাতির যথার্থ ইতিবাচক দিনগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক তাঁর 'পিশাচ-পুরোহিত' গ্রন্থটি সমালোচনা করতে গিয়ে যে-কথা বলেছিলেন তা' পর্যালোচনা করলে দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক হিসেবে কৃতিত্ব এবং রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় রচনার প্রতি (বা অনুবাদের) তাঁর আসক্তিজনিত ট্র্যাজেডির আরম্ভের ক্ষণটিকে আমরা জানতে পারি। সমালোচনাটি সুরেশচন্দ্রের বলেই তা' আরও বেশি মূল্যবান :

> "আমরা "পিশাচ পুরোহিত" নামক একখানি অদ্ভুত উপন্যাস সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় একজন "কল্পনাকুশল প্রতিভাবান" ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের আখ্যানবস্তু হইতে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। দীনেন্দ্রবাবু এমন সুকৌশলে "পিশাচ পুরোহিত"কে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছেন যে, তাহাকে নিতান্ত পর মনে হয় না। সচরাচর ইংরেজি অনুবাদের বিকট 'বোটকা' গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যথিত পীড়িত হয়। ইহাতে তাহার লেশমাত্র নাই। দীনেন্দ্রবাবু অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পুষ্পিত, প্রাঞ্জল, মধুর, সরস রচনা পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশে অনেক লেখকের আদর্শ হইতে পারে। দীনেন্দ্রবাবুর সেই ভাষার ইন্দ্রজালে এই উপন্যাসখানিকে মৌলিক বলিয়া ভ্রম হয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন করিয়া দীনেন্দ্রকুমারের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদিগের দরবারে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, সকলের প্রিয়। সেক্ষেত্রে আমি যদি লণ্ঠন ধরিয়া দীনেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে যাই, তাহা হইলে আমিও হাস্যাস্পদ হইব। বলাবাহুল্য আমার হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা নাই।

"পিশাচ পুরোহিতে"র পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে, আমরা দীনেন্দ্রবাবুকে সত্যপ্রিয়তার জন্য ধন্যবাদ দিব। এমনই এই দেশের অবস্থা, এমনই কালের প্রভাব, সাহিত্যে সত্যপ্রিয়তার প্রশংসাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"[৫৫ক]

সুরেশচন্দ্র-কর্তৃক দীনেন্দ্রকুমারকে সত্যপ্রিয়তার জন্য ধন্যবাদ—বিদেশী সাহিত্যের কাছে ঋণ স্বীকার করার জন্য। অতঃপর পিশাচ পুরোহিতের সর্ববিভাগে ভূয়সী প্রশংসা করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন :

"পিশাচ পুরোহিত" আমরা এক নিশ্বাসে পাঠ করিয়াছি, কয়েক পৃষ্ঠা অগ্রসর হইবার পর বাধ্য হইয়া "পুরোহিতে"র বিস্ময়াবহ জটিল চরিত্রের গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়াছি : "পিশাচ পুরোহিত" অদ্ভুত রসে পাঠকের হৃদয় প্লাবিত করে, আর আগ্রহের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া পাঠকের চিত্তকে বন্দী করিয়া রাখে।"[৫৫খ]

পরিশেষে সাহিত্য-সম্পাদক দীনেন্দ্রকুমারের সাহিত্যচচার স্বক্ষেত্র সম্পর্কে সবচেয়ে দামি মন্তব্যটি করেছেন :

"দীনেন্দ্রবাবু ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে কৌতূহলের কোহিনূর উপহার দিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব না। প্রশংসা করিব না, তাহাকে ও বাঙ্গালীর পাঠক-সম্প্রদায়কে অনুযোগ করিব।

দীনেন্দ্রকুমার প্রতিভাশালী। তাঁহার "পল্লীচিত্র" ও "পল্লীবৈচিত্র্য" বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালার পল্লী-শ্রী ও পল্লী-বাসীর প্রকৃতি তিনি যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, এযুগে আর কেহ তেমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। করুণ রসে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রকৃতি লইয়া মৌলিক উপন্যাস লিখিবেন না কেন?

বাঙ্গালীর রুচি যদি বিকৃত না হইত, বাঙ্গালী যদি ঢাকাই মসলিন ছাড়িয়া জমকালো ছিটের আদর না করিত তাহা হইলে দীনেন্দ্রবাবু মৌলিক

রচনায় নিরত থাকিতেন। কিন্তু সাহিত্য শুধু বর্তমানের বস্তু নয়। ভবিষ্যৎ সাগ্রহে দীনেন্দ্রবাবুর পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। দীনেন্দ্রবাবুকে আমরা অনুরোধ করি, এ দেশের মৌলিক পটে তিনি এইরূপ কৌতূহল-চিত্র অঙ্কিত করুন। বিদেশ হইতে রত্নচয়ন নিঃস্ব সাহিত্যের পক্ষে আবশ্যক বটে, কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের প্রতিভা তাহার মূল্য হইতে পারে না।"[৫৫গ]

সুতরাং, একথা আমরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যে, এমন কি তা অনুবাদ হলেও, দীনেন্দ্রকুমার সর্ববিভাগে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ছিলেন: ভাষার স্বচ্ছতা, অনুবাদের সাবলীলতা, কাহিনী গ্রন্থন ও কথনে নৈপুণ্য, কৌতূহল ও উৎকণ্ঠতার বিস্তার, হাস্য-পরিহাসের অত্যন্ত স্বাভাবিক অবকাশ সৃষ্টি ইত্যাদিতে তাঁর জুড়ি পাওয়া যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত স্বক্ষেত্র ছিল পল্লী-বিষয়ক রচনা। রহস্য-রোমাঞ্চ রচনার মধ্যে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ইতস্তত প্রকাশিত হলেও দীনেন্দ্র-প্রতিভা বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল পল্লী-বিষয়ক রচনার সূত্রেই। এই প্রতিভা রহস্য-উপন্যাসের অনুবাদে ব্যবহৃত হওয়ায় সাহিত্য সম্পাদকের অনুযোগ অংশত দীনেন্দ্রকুমারের প্রতি হলেও, প্রায় পুরোটাই বাঙালি পাঠকের তরলচিত্ততার প্রতি। তাঁর এই মূল্যায়ন যথার্থ সন্দেহ নেই। দীনেন্দ্রকুমারের পল্লী-বিষয়ক রচনা সমকালে বন্দিত হলেও তা' তাঁকে অর্থকৌলিন্য এনে দেয়নি। তাছাড়া পল্লী-বিষয়ক রচনার প্রসার অভিজাত পাঠকসমাজে হলেও লেখক-হিসেবে দীনেন্দ্রকুমার নিশ্চয়ই সর্বত্রগামী হতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর রহস্য-রোমাঞ্চ রচনার প্রাচুর্যের প্রধান কারণ: তিনি লেখাকেই পেশা-হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অন্য কোনো জীবিকা ছিল না, সুতরাং তাঁকে অবিরল লিখে বা অনুবাদ করে যেতে হয়েছে।

বাংলাদেশের হৃদয়খানি ···

দীনেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তার একদিকে আছে তাঁর রহস্য রোমাঞ্চশ্রেণীর রচনা, আর একদিকে আছে পল্লীবিষয়ক রচনাগুলি। একশ্রেণীর পাঠকের কাছে যেমন তাঁর লঘুরচনাগুলি প্রশ্রয় পেয়েছিল, তেমনি অন্য একশ্রেণীর পাঠক তাঁর পল্লী-বিষয়ক রচনার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙালিজীবনের চিরকালীন সুর। তাঁর পল্লীবিষয়ক রচনার সংখ্যা প্রাচুর্য্য আমাদের বিস্মিত করে। তার কিছু গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে; বাকি সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা থেকে দুই মলাটের

ভিতরে বন্দী হয়নি।

প্রবাসী পত্রিকায় প্রিয়রঞ্জন সেন 'বাংলা সাহিত্যে একশতটি ভাল বই'-এর একটি তালিকা প্রণনয়ন করেছিলেন।[৫৫ঘ] এ-জাতীয় তালিকায় অবশ্যই প্রণয়নকারীর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ প্রতিফলিত হয়। এ-জাতীয় তালিকায় তাই অসম্পূর্ণতা এড়ানো যায় না। তথাপি এতে সেকালের এক বিশিষ্ট পাঠকের ভালো লাগার একটা আভাস পাওয়া যায়। অন্তত সমকালে তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি যে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল—এটাও বোঝা যায়। এই তালিকায় প্রিয়রঞ্জন সেন অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থখানিও তালিকাভুক্ত করেছিলেন। সেকালে প্রণীত এই তালিকা তো আজকের মিডিয়া-মাস্টারদের 'বেস্টসেলার'-এর সপ্তাহান্তিক তালিকা নয়, তাই সম্ভবত কিছু ভরসা করাই যায়।

দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনার দুটি দিক : চিত্র জাতীয় এবং চরিত্রজাতীয়। অবশ্য এই জাতীয় রচনায় দীনেন্দ্রকুমার পথপ্রদর্শক নন। চিত্রজাতীয় রচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে আমরা নাম করতে পারি রবীন্দ্র-সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের। এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন :

> "দেশের জীবনকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে, সংসারের ও সমাজের সবক্ষেত্রে সব অবস্থায়, জানিতে ও জানাইতে বাসনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সাধনার মাধ্যমে। তাঁহার ছোটগল্পে এই উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হয়। তবে গল্পগুচ্ছে যে-বাঙ্গালী মানুষের জীবনের যে স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাতে অন্দর-বাহির কোনটিই ঢাকা নাই। বাঙ্গালী জীবনের শুদ্ধ বাহিরের রূপটুকু, তাহার সংসার সমাজে মেঘরৌদ্রচ্ছবি, আঁকিবার জন্য তিনি নবীন লেখকদের আহ্বান করিয়াছিলেন।"[৫৫ঙ]

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন, আগেই বলেছি : সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। সাধনা পত্রিকা যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখন শ্রীশচন্দ্র চাকরীর জন্য বিহারে বাস করছিলেন। তিনি বিহারের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতী, বঙ্গদর্শন ও সাধনাতে বিহারের পল্লীজীবনচিত্র এঁকেছিলেন, যেমন : রোপণীর গান, চাকচন্দা, লোরিকের গান ইত্যাদি, আর গ্রামবাংলার জীবনচিত্র এঁকে-ছিলেন : পুরুৎ ঠাকরুণ, জামাইষষ্ঠী ইত্যাদিতে। শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার পল্লীবিষয়ক রচনায় বিশেষ-কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর চিত্রগুলি 'চিত্র-বিচিত্র' নামে সংকলিত হয়েছে (১৯০২)।[৫৫চ] তাঁর চিত্রে গল্পরসের আস্বাদ

পাওয়া যায়। এছাড়াও তৎকালীন সাময়িকপত্রের পাতায় চিত্র ও চিত্রগল্প রচনা করেছিলেন : শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬০-১৯২০)। তাঁর রচিত পারিবারিক ও গার্হস্থ্য চিত্রের মধ্যে আছে : আমাদের পুতুলের বিয়ে, শৈশবে ধর্মশিক্ষা, কন্যাদায় ইত্যাদি। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষষ্ঠীব্রতের কথা সামাজিক চিত্র এবং শিবধন বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠী, রাজনারায়ণ বসুর আমার ছাত্রাবস্থা, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর ষ্টুডেণ্ট মেস, ডেলি প্যাসেঞ্জার, শরৎচন্দ্র রাহার কলিকাতার ছাত্রাবাস-ও উপভোগ্য রচনা সন্দেহ নেই। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯৬০) বহু গল্পচিত্র ভারতী পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপহার দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহের (১৮৫৮-১৯৩৭) উড়িষ্যার চিত্র (১৯০৩) উপভোগ্য রচনা। উপন্যাসের একটি কাহিনী-সূত্র থাকলেও উড়িষ্যার চিত্র চিত্রমূলক রচনাই। সামন্ততান্ত্রিক উড়িষ্যায় লোকজীবনের কাহিনী এতে পাওয়া যায়। যেমন : 'শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব' (ভারতী, কার্তিক ১৩০৮) :

> "কল্যাণেশ্বর মহাদেব জাগ্রত দেবতা। এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময়ে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় ও সাতদিন পর্যান্ত একটী মেলা বসে। অন্য সময়েও বিদেশ হইতে অনেক যাত্রী দেবদর্শনে আসিয়া থাকি।"
> (পৃ. ৫৭)।

'উড়িষ্যার মঠ' (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮) রচনাটিতে ইতিহাস বা স্থানীয় ইতিহাস আছে, শেষাংশে আছে সরস বর্ণনা :

> "মোহান্ত বাবাজীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ। তাঁর মুখশ্রী সুন্দর শান্তিপূর্ণ।…
> সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আজ শুক্ল প্রতিপদ তিথি। চন্দ্রের কোন খোঁজ-খবর নাই। ··মঠের ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে।…"
> (পৃ. ৫০)।

'কাটজুড়ী তীরে' রচনায়ও উড়িষ্যার ছবি ভালোই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক :

> "সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে একটী যুবক কাটজুড়ী বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার সম্মুখে শুভ্রদেহা বালুকাময়ী নদী। …একদল বালক বাঁধের উপর বসিয়া উচ্চকণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটী গাহিতেছিল—
>
> কি সুন্দর মুরলী পাণি রে সজনী!

অঙ্কু কে দিব অণ্ডা আনিবে সজনী।
দিনে যমুনাকু মু যে গলি গাধোই,
বাটরে দেখিলি মু প্রাণ মাধোই, রে সজনী।
বাঙ্ক বাঙ্ক করি মোতে দেলে অনাই,
তরকী তরকী মু অইলি পলাই রে সজনী।
ধাঁই ধাঁই সে যে মো ধইলে অঞ্চল,
মু ডেঁই পডিলি যাই যমুনা জলে রে সজনী॥"

(ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৮)

পল্লীবিষয়ক রচনা[illegible]ক্ষেত্রে দীনেন্দ্রকুমারের বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত। পল্লীচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল মেহেরপুর থেকে ১ বৈশাখ ১৩১১ (২৫ মে ১৯০৪)। এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো: পল্লীবৈচিত্র্য (আশ্বিন ১৩১২), পল্লীকথা (১৩২৪), পল্লীবধূ (২০ মার্চ ১৯২৩) পল্লীচরিত্র (৭ মে ১৯২৩), দেবতার ভর ইত্যাদি। শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রায় গল্পগ্রন্থের সমতুল্য। পল্লীকথাকেও গল্প-শ্রেণীভুক্ত করা যায়। পল্লীবধূ তো পল্লীর পটে উপন্যাস।

সেকালেও পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্য গ্রন্থদুটির কদর হয়েছিল, সংস্করণ হয়েছিল একাধিক, বন্দিত হয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমার অভিজাত সাহিত্য সমাজেও। ১৯২২ সালে রায় এণ্ড রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে পল্লীচিত্রে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন লেখক, এই সংস্করণে স্নানযাত্রার মেলা নামে একটি নূতন চিত্র সংযোজিত হয়।

স্নানযাত্রার মেলা ছাড়া পল্লীচিত্রে অন্যান্য চিত্রগুলি হলো:

সেকালের পাঠশালা, ভগবতীযাত্রা, দশহরা গঙ্গাপূজা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।—অর্থাৎ বাংলার গ্রামের পাল-পার্বণের চিত্র এগুলি।

জন্মস্থান মেহেরপুর ও মেহেরপুর-সন্নিহিত অঞ্চল—ভৌগোলিক পরিভাষায় আমরা যাকে উত্তর-মধ্যবঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি—এসবই ঐ অঞ্চলের পল্লীবঙ্গের জনজীবনের ছবি। আমরা ইতিপূর্বে দীনেন্দ্রকুমারের পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করেছি পল্লীচিত্র প্রসঙ্গে সেই প্রশংসাবাক্যই পুনর্বার উচ্চারণ করতে হবে। গ্রামের নিতান্ত অলস-মন্থর জীবনেও যে এত রস-রসিকতা, সুখ-স্বস্তি আর এত বর্ণময় বর্ণনার অবকাশ আছে তা পল্লীচিত্র না পড়লে বোঝা যায় না।

দীনেন্দ্রকুমার কোন্ পল্লীবাংলাকে দেখেছিলেন? তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষাক্ত নিশ্বাসে পুড়ে যাওয়া গ্রাম। যে-গ্রামে অভাব, দারিদ্র্য আর বেঁচে থাকার অসঙ্গতি পদে পদে। দীনেন্দ্রকুমার দেখেছিলেন সেই গ্রাম, যখন সমস্ত গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে গেছে বা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে—মানুষের কাছে বাড়ছে শহরের টান।—এই নিতান্ত নীরস পল্লীজীবনকেও দীনেন্দ্রকুমার মন্ত্রবলে রঙরেজিনীর মায়ায় এঁকে তুলেছেন। গ্রামের সহজ জীবন, গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠান, রীতি নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার আর তার ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র সব মানুষের কথা অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে উঠে এসেছে দীনেন্দ্রকুমারের কলমে।

পল্লীচিত্র রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত। সেকালের বহু স্বনামখ্যাত সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব পল্লীচিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রস্তাবটি ছাড়া অন্যগুলি বঙ্গের গ্রাম্য উৎসবের বিবরণ হলেও পল্লীবৈচিত্র্যের এগারটি প্রস্তাব বা প্রবন্ধের সবগুলিই গ্রাম্য উৎসবের ছবি: কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, কার্তিকের লড়াই, নবান্ন, পোষলা, পৌষ-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ মেলা, শ্রীপঞ্চমী, শীতলা-ষষ্ঠী, দোলযাত্রা ও চড়ক।—এই সমস্ত উৎসবের সঙ্গে ধর্ম ব্যাপারটি জড়িত থাকলেও দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনীয় বিষয় ধর্ম নয় মানুষ, ধর্মীয় আচার নয় মানবাচার, শাস্ত্র নয় লৌকিক পরিমণ্ডল (পরিশিষ্টে দীনেন্দ্রকুমার ও লোকসংস্কৃতি অংশটি দ্রষ্টব্য)। তাই পল্লীচিত্রে মোটামুটিভাবে বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই ছয় মাস এবং পল্লীবৈচিত্র্যে কার্তিক থেকে চৈত্র—বাকি ছয় মাসের বাঙালিজীবনের গ্রাম্য উৎসবের কথা লিখেছেন দীনেন্দ্রকুমার। পল্লীবিষয়ক এই ধারাভাষ্যকে আমরা বারোমাসের তেরো পার্বণ বলে অভিহিত করতে পারি।

পল্লীচরিত্র গ্রন্থটি পল্লীর নানান চরিত্রের স্মৃতিচারণ। এতে দেখা দিয়েছেন: দুখীরাম, গ্রামের পিসিমা, দুর্বাসাঠাকুর, সেকালের ডেপুটী, গৃহহীন, পেয়াদা, দত্তগিন্নি প্রমুখ।

সেকালের চারটি সেরা সাময়িকপত্র সাহিত্য, ভারতী, বঙ্গদর্শন ও ভারতবর্ষের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জলধর সেন প্রমুখ দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনার কতটাই পক্ষপাতী ছিলেন, তা তাঁদের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি:

"দীনেন্দ্রবাবু বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর চির-উপাসক। বাঙ্গালায় পল্লীশ্রীর

অনেক চিত্র ও পল্লীবাসীর বিবিধ সুখ দুঃখের বহুকাহিনী এই ভাবুক-ভক্তের ঐন্দ্রজালিক তুলিকার স্পর্শে সমুদ্ভাসিত ও সাহিত্যভাণ্ডারের চিরন্তন সম্পদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ পল্লীচিত্র চয়নে দীনেন্দ্রবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আশা করি, দীনেন্দ্রবাবুর 'পল্লীচিত্র' বঙ্গসাহিত্যে সাদরে অভিনন্দিত হইবে।"

ভারতীর সম্পাদক :

"লেখক আশ্চর্য ওস্তাদী ঢঙে, অপরূপ লীলাভঙ্গীতে প্রাচীন বাঙ্গালাকে জীবন্ত ফটোর মতোই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই চিত্রগুলিতে। এ বই যিনি না পড়িবেন বাঙ্গালা দেশের সহিত তাঁহার পরিচয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়াও তিনি বাঙ্গালার কিছুই জানিবেন না। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার পল্লী তাঁহার কল্পনার সামগ্রীর থাকিয়া যাইবে। এ গ্রন্থে বাঙ্গালার পল্লীর কথা, তার নর-নারীর পরিচয়, তার সুখ-দুঃখের ছবি, তার আশা আনন্দের কাহিনী যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনোরম ছন্দে। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজা-রাজড়ার কাহিনীর চেয়েও মনোজ্ঞ আর উপভোগ্য হইয়াছে গ্রন্থখানি। বাঙ্গালার ইতিহাসে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিবৃত্তে, বাঙ্গালার রস-সাহিত্যে এ-গ্রন্থ বহুমূল্য সম্পদ।"

পল্লীচিত্র উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দীনেন্দ্রকুমারকে লিখেছিলেন :

"ইহা আমাদের এই তরুপল্লব মর্ম্মরিত ছায়াময় বাংলাদেশের হৃদয়ের মধ্য হইতে শান্তি ও আনন্দ বহন করিয়া আমাকে উপহার দিয়াছে।"

নাট্যাচার্য ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থকারকে লিখেছিলেন :

"আপনার পল্লীচিত্রের চিত্রগুলি সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা-চিত্রিত ছবির ন্যায় সুস্পষ্টরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়; চিত্রগুলি যেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর, ভাষাও সেইরূপ সরল ও সুমিষ্ট। এ পুস্তক পণ্ডিতবর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র কৃত সুবিখ্যাত 'গোবিন্দ সামন্তে'র ন্যায় আদরের যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

'পল্লীবৈচিত্র্যে'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে জলধর সেন মন্তব্য করেছিলেন :

"…'পল্লীচিত্র' পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্য। কিন্তু পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে এই পল্লীজীবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস, যে উন্মাদনা, যে যে বিশেষভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বড়ই উপভোগ্য, তাহাই পল্লী-

জীবনের বৈচিত্র্য। সুনিপুণ চিত্রকর এই জন্যই এই পুস্তকের নাম পল্লীবৈচিত্র্য রাখিয়াছেন।”

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়ে আমাদের পরাধীন জাতির জীবনে ঘরের দিকে মুখ ফেরাবার আয়োজন এবং পালা চলছিল, বিংশ শতকের শুরুতেই পল্লীর দিকেও আমাদেব দৃষ্টি গিয়েছিল। পল্লীকে জানবাব প্রচেষ্টা ও পল্লীসঞ্জীবনের নানান উদ্যোগও গৃহীত হচ্ছিল। এ সমস্তই ছিল পবাধীন জাতির আত্মতাড়নাব ফল। দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনাও সেই ভিতরের তাগিদেরই ফসল।

দীনেন্দ্রকুমারেব সমকালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বঙ্গপল্লীর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর রচনার বিষয় ছিল দীনেন্দ্রকুমারেরই মতো। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের অঙ্কন নৈপুণ্য এবং পল্লীজীবনের প্রতি অসম্ভব হার্দ্য অনুভবের জগৎটি অন্য কারও করায়ত্ত হয়নি বলেই দীনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে কারও তুলনাই চলতে পারে না। (পরিশিষ্টে দীনেন্দ্রকুমার ও লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই হার্দ্য অনুভবকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠার সূত্রটি নিহিত আছে তাঁর গ্রাম্য-জীবন ও গ্রাম্যসাহিত্য-সংক্রান্ত চিন্তন-ভাবনে। তার কিছুটা আমরা পাই পল্লী-বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকায়, নিবেদনে আর কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধে। ‘গ্রাম্য সাহিত্যের স্বরূপ’ (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ. ৩০৯), ‘বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা’ (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃ. ৫০) ইত্যাকার প্রবন্ধ এ-জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত। গ্রাম্য সাহিত্যের স্বরূপ-প্রবন্ধে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন :

> “সাহিত্যের ধাতুগত পার্থক্য লইয়া মহারথীরা হাতাহাতি করুন। বড়-বড় সাহিত্যের মানোয়ারী জাহাজ ভাষার সমুদ্রে পাখা মেলিয়া ভাসিতে থাকুক, তাহার গৌরবচ্ছটার নীচে, “আমাদের গ্রাম্য সাহিত্য” আমাদের পিতৃ-পিতামহ বৃক্ষ ছায়া সমাচ্ছন্ন শান্তি-সুখ-পরিবৃত পল্লী কুটীরের গোময়লিপ্ত আঙ্গিনাস্থিত মৃণ্ময় তুলসীমঞ্চে মৃৎ-প্রদীপের ম্লান রশ্মি বিদীর্ণ করিবে।”

গ্রাম-সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমারের মনোভাব এখানে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। পল্লীবৈচিত্র্য গ্রন্থের নিবেদন-অংশেও পল্লীজীবনের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ব প্রকাশিত হয়েছে :

> “বঙ্গে আজ বাঙ্গালির হৃদয়ে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে……।
> কিন্তু আমরা এই কোটী কোটী বাঙ্গালী ;—সকলেই কি নগরবাসী? সাতকোটী বাঙ্গালীর কয়জন নগরে বাস করেন?…অধিকাংশ বাঙ্গালীই

পল্লীবাসী ;⋯ আমরা পল্লীগ্রামের ছায়ায় মানুষ হইয়াছি,⋯সেখানকার নাপিতকাকা, পুরুত জ্যেঠা,⋯মালী বৌ আমাদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে ;⋯বঙ্গপল্লীর বৈচিত্র্যের কথা কি এই অবৈধ প্রণয় ও ব্যাভিচারে পূর্ণ লোমাঞ্চকার উপন্যাসের হলাহলে জর্জ্জরিত সমাজের বক্ষে এক বিন্দু সুখের ও শান্তির হিল্লোল বহন করিয়া আনিবে না ?"

পল্লীকথার ভূমিকায়ও দীনেন্দ্রকুমার এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন :

"আজকাল অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের রচনায় পল্লীবাসীগণের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বেদনা-বাসনা-ভ্রান্তির নানা উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহাদের রচিত পল্লীজীবনের এই আখ্যায়িকাগুলি রচনাগুণে মনোমুগ্ধকর হইলেও, পাঠ করিয়া পল্লীবাসীগণের মনে হয় অনেকেরই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগুলি যেন খাঁটি পল্লীগ্রামের মানুষ নহে ; তাহাদের সমাজ যেন ঠিক পল্লীগ্রামের সমাজ নহে। যেন পল্লী-বাসীর মুখোস পড়িয়া কেহ গ্রামাফোনের 'রেকর্ড' হইতে পল্লীবাসীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে একটা অস্বাভাবিক সুর বাহির করিতেছেন।"

পল্লীর তুচ্ছ ঘটনা কতো হৃদয়গ্রাহী ও মমত্বে পরিপূর্ণ হতে পারে, কতো তার ডিটেইল, পেন-ইঙ্কের স্কেচের মতো তা দীনেন্দ্রকুমার কথায় এঁকে প্রমাণ করেছেন। "এদিক দিয়ে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ।"[৫৬] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীজীবন-ভাবনার সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীভাবনার বৈশাদৃশ্য সহজেই আমাদের নজরে পড়ে। তবু একটি কথা এ-প্রসঙ্গে জরুরি যে, দোষ-গুণে জীবন্ত পল্লীসমাজের রেখাঙ্কনে দীনেন্দ্রকুমারকে অগ্রজের মর্যাদা দিতে হবে। দীনেন্দ্রকুমার বাইরের দিক থেকে দেখেছেন, আর শরৎচন্দ্র আর-একটু ভেতরের দিক থেকে। দীনেন্দ্র-সাহিত্যাগ্রজ জলধর সেন তো প্রত্যক্ষভাবেই পল্লীচিত্রাঙ্কনে অনুজের কাছে ঋণবদ্ধ। দীনেন্দ্রকুমারের এ-জাতীয় রচনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য মূল্যবান :

"পল্লীচিত্র বইখানি সেকালে কথায় ভরপুর। কথা মানে ছবি, রঙিন ছবি। প্রায় একশ বছর আগেকার মধ্যবঙ্গের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের জীবনের কতকগুলি উজ্জ্বল খণ্ডচিত্র।⋯বর্ণনার মধ্যে কোন রকম আতিশয্য নেই ; রোমান্সের কণাটুকু নেই, আহা-মরি নেই, দূর-ছাইও নেই। সোজাসুজি যাকে সাধুভাষায় বলে বিশদ, সেই বর্ণনা। সাহিত্যের বাস্তব রূপ নয়, প্রতিদিনের সামান্য জীবনে যা ঘটে⋯।"

এই সমস্ত গুণের জন্য সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দ্বিধাহীন-চিত্তে মন্তব্য করেছেন :

> "দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীচিত্র' (১৩১১ সাল) বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীচরিত্র' এবং 'পল্লীকথা'-ও সেই মতো উপভোগ্য।"[৫৭]

আজ যখন গ্রামজীবনের শুদ্ধতা বিপন্ন, শহর ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে গ্রামীণ সারল্য, ইউরোপীয় দেশগুলির মতো গ্রাম অদূর ভবিষ্যতে পরিণত হতে পারে গল্পে, "পল্লীর সেই সৌন্দর্য এবং ত্রুটি দুই-ই শহুরে-দস্যু অপহরণ করে নিয়ে গেছে"[৫৮] তখন দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনার মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। আমরা জানি, সমাজবিজ্ঞানগত কারণেই গ্রাম ভাঙবে এবং শহর গ্রাম্য দাওয়ার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবেই—পুরোনো আত্মকেন্দ্রিকতা ও যৌথ-জীবন চূর্ণ করে উঠে আসছে, আসবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগর-সংস্কৃতি, সেখানে এই রচনাগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। জলধর সেন একদা যে আশঙ্কা ও আশার দোলায় দুলেছিলেন :

> "পল্লীজীবনের এই সরল সুমধুর বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, কিছুদিন পরে হয়ত ইহার অস্তিত্বই লুপ্ত হইবে। যাদুঘরে রক্ষিত লুপ্ত জীবের দেহাবশেষ দেখিয়া আমরা অতীতের কতকটা অনুমান করিতে পারি। পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহে বাঙ্গালীর সবই ভাসিয়া যাইতেছে; দীনেন্দ্রবাবুর 'পল্লীবৈচিত্র্য'ও যে কিছু দিনের মধ্যে পল্লীর চিত্রশালায় পরিণত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?"

—এই আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সেই কারণেই দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনার সংরক্ষণ ও পাঠ আজ খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি।

উপসংহৃতি

দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্য সাধক হিসেবে দিগন্তবিস্তারী ভূমিকার পরিচয় রাখলেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার মধ্যে বেশ কিছু স্ববিরোধ আছে। তেমনই তাঁর সাহিত্য-সংক্রান্ত ভাবনারও কিছু সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায়।

দীনেন্দ্রকুমার গদ্যে সাধুরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন চলিত ভাষায়

তাঁর ছোটগল্পগুলি রচনা করছিলেন এবং সবুজপত্রের মতো পত্রিকা যখন চলিত-ভাষার পতাকাটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, তখন দীনেন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের হাতে চলিতভাষার প্রয়োগকে মোটামুটি সমর্থন করলেও সাহিত্যে চলিত ভাষা ও কথ্যরীতির স্বেচ্ছাচারিতাকে আক্রমণ করে সাধুভাষার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন :

"কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ভাষাকে বাণপ্রস্থাশ্রমে পাঠাইয়া, কথোপ-কথনের প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারেই আখ্যায়িকাগুলির সরসতা বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহা পাঠক-পাঠিকাব কল্পনার উপর প্রভাববিস্তার করিবে। কিন্তু সকলে এই ধারণার সমর্থন করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। রসসৃষ্টির পক্ষে সাধুভাষার উপযোগিতা কত অধিক রবান্দ্রনাথের ছোটগল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ; বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, অতবড শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ, ভাষার উপর যাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বর্ত্তমান, তিনি একালে তাঁহার অতুলনীয় ভাষাকে অধিকতর মর্মস্পর্শী ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায় যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কালের তরুণ লেখকেরা তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের ব্যর্থ চেষ্টায় যে সহজায়ত্ত ও শ্রুতিকঠোর, দুঃসহ ন্যাকামী পরিপুষ্ট সংকরভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে চিরপ্রচলিত এবং আমাদের জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ ভাষার মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন।..."৬০

সাহিত্য ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কে এই মনোভাব পশ্চাদ্‌পদতা হলেও, লক্ষণীয়, দীনেন্দ্রকুমার সামগ্রিকভাবে চলিত ভাষার বিরোধিতা করেন নি, বিরোধিতা করেছেন অনুকরণকে এবং চলিত ভাষায় 'ন্যাকামী'কে প্রাধান্য দেওয়াকে। ভাষার যে কোমলতা এবং নমনীয়তা (যেমন : যাইনে, পারিনে, জানতেম ইত্যাদি ক্রিয়াপদ। গদ্যে কবিত্ব-ব্যঞ্জনা ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বাভাবিক হয়েছিল। তার ব্যর্থ অনুকরণই চলিত-গদ্যে 'দুঃসহ ন্যাকামী' এনে দিয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমার এই ন্যাকামীর বিরোধী ছিলেন।

ভাষা ব্যবহারে আজীবন সাধুগদ্যে কলম-চালনা করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার। তথাপি, ভাষা ব্যবহারে ও বিন্যাসে তাঁর বিরল-কৃতিত্ব স্বীকৃত :

"দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীচিত্র' অনেক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শেখবার আদর্শ পুস্তকগুলির অন্যতম ছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট

বছর আগে বাংলা সাহিত্যের লেখকের গৌরব এর চেয়ে আর কিসে প্রকাশ পেত। মনে রাখতে হবে তখন রবীন্দ্র-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর কোন পুরস্কারই ছিল না। (সুকুমার সেন: পল্লীচিত্রের ভূমিকা, আনন্দ সংস্করণ)।

শুধু ভাষা সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের প্রকাশ নয়, তিনি সমস্ত জীবন ধরে সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করেছেন, পড়াশোনা করেছেন দেশ-বিদেশের সাহিত্য নিয়ে—আমাদের পাঠকের জন্য সেই পাঠের অভিজ্ঞতাকে পরিবেশনও করেছেন নানা রচনায়। যেমন: 'চীনের গল্প' (ভারতী, কার্তিক ১৩০০, পৃ. ৪০৫) কিংবা 'রবার্ট ব্রুসের গল্প' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১৯৩)।

প্রথম প্রবন্ধের জন্য দীনেন্দ্রকুমারকে দেখি নিম্নোক্ত রচনাগুলির সহায়তাগ্রহণ করতে:

ক. ওয়েইফস্ এণ্ড স্ট্রেইস ফ্রম দি ইস্ট (ট্রুব্যুয়ার এণ্ড কোং)।

খ. জার্নাল অব্ দি এন. ই. ব্রাঞ্চ অব দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি।

গ. দি চায়না মেল।

ঘ. দি নর্থ চায়না হেরাল্ড।

ঙ. ট্রানস্লেশন ফ্রম দি পিকিং গেজেট।

বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় এ-জাতীয় পরিচয়-প্রদান-মূলক প্রবন্ধ নিশ্চয়ই আমাদের সাহিত্যের সীমানা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল, যেমন করেছিল দীনেন্দ্রকুমারকৃত বিপুল পরিমাণ অনুবাদ-সাহিত্য। মৌলিক রচনার মতো গুরুত্ব দিয়েই তিনি অনুবাদের কাজ করেছিলেন—আশ্চর্য স্বচ্ছ, সাবলীল অনুবাদ-কর্মের জন্য বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত।

জীবনের একটা বড়ো অংশ কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস করলেও দীনেন্দ্রকুমার তাঁর জন্মস্থান মেহেরপুরকে কদাপি ভোলেন নি। যখনই অবকাশ পেতেন তিনি মেহেরপুরে যেতেন, তাছাড়া কলকাতায় বাস করেও মনে-প্রাণে তিনি থেকে গিয়েছিলেন গ্রামের মানুষ। এই কারণেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের ভূমিকার উপান্তে মেহেরপুরের নামই উল্লিখিত হয়েছে। রহস্য-লহরী কার্যালয়ের ঠিকানা হিসেবে মেহেরপুরের ঠিকানাই ছাপা হতো।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। জীবনের বাকি দশ বছর বেদনার সংবহন ও বিষাদের ভার বহন করেন দীনেন্দ্রকুমার। ইতিপূর্বেই উপযুক্ত পুত্রের বিয়োগ-

ব্যথাও তাঁকে বহন করতে হয়:

> "...পত্নীবিয়োগের পর শোকের পর শোকের কঠিন আঘাতে আমার মন অবসন্ন, বার্ধক্যপ্রপীড়িত দেহ জীর্ণ। জীবন-সন্ধ্যায় ভবনদীর কূলে বসিয়া অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিতেছি, "পার-পণ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, প্রভু! অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টি অবরুদ্ধ, জীবন-ধারণের কোন প্রলোভন বর্ত্তমান নাই, ভাঙ্গা সংসার আবার গড়িয়া তুলিব, সে শক্তিও নাই। আমার সকল সন্তাপ হরণ করিয়া এই রিক্তহস্ত নিরলম্বন পথিককে পরপারে লইয়া যাও। যাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, তাহারা একে একে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, এই ব্যর্থ জীবনে কোন আশা, কোন কামনা নাই।..."[৬১]

সেকালের স্মৃতিতে এমন মর্মস্পর্শী হতাশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে বার বার। শোকতপ্ত দীনেন্দ্রকুমার জীবনের শেষ দিকে বসবাসের জন্য মেহেরপুরেই ফিরে আসেন।

বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি অবশ্যই ছিলেন 'রিক্তহস্ত নিরবলম্বন'। সাহিত্য জীবিকা হলেও, যা উপাজন করেছিলেন তাতে জীবনধারণ চলত নিশ্চয়ই কিন্তু আশানুরূপ অর্থলাভ হয়নি তাঁর। জীবৎকালে লেখার জন্য প্রশংসিত হলেও প্রাপ্য মতো সাহিত্যসম্মান লাভ করেন নি। বরং বহুক্ষেত্রে রীতিমতো অবজ্ঞাত হয়েছিলেন। সমকালে এবং মৃত্যুর পরেও একশ্রেণীর উন্নাসিক পাঠক তাঁর নামের পেছনে দেগে দিয়েছেন 'রবার্ট ব্লেকের স্রষ্টা' অভিধাটি। কেউ কেউ দীনেন্দ্র মূল্যায়নের সময় বেমালুম ভুলে যান দীনেন্দ্রকুমারের সামগ্রিক সাহিত্য-সাধনার কথা। সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা দীনেন্দ্রকুমার সম্পর্কে অধিকাংশই হয় সম্পূর্ণ নীরব নতুবা রীতিমতো ব্যয়কুণ্ঠ।

সাহিত্য-সংসারে যে-সমস্ত সাহিত্যিক তাঁর সুহৃদরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন, সাহিত্য সমাজে যাঁরা একদা আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার ক্ষেত্রে তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন, তাঁরা পরে আর ফিরেও তাকান নি। সাহিত্য-সংসারে যাঁদের বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরাই আর্থিক ও সাম্মানিক দিক থেকে বঞ্চিত করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমারকে, এমন-কি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পেছনেও ছিল বঞ্চনার এক নিষ্ঠুর ইতিহাস। তথাপি সমগ্র জীবনে দীনেন্দ্রকুমার কখনও সাহিত্য-সেবা থেকে বিরত হন নি:

> "আমি আজ একাকী স্বজন-বিরহিত প্রবাসে দুঃখ-পূর্ণ শোকসন্তপ্ত জীবন

> বহন করিতেছি। কেবল যে দেবীর পূজায় প্রথম যৌবন নিয়োজিত করিয়াছিলাম, এত দুঃখ-কষ্টে শোকেও সেই আরাধ্যা দেবীর উপাসনা ত্যাগ করি নাই, এবং ইহাই আমার শোকে-দুঃখে, বার্দ্ধক্যের নানা রোগ-নিপীড়িত জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়; নতুবা হয় ত এত দিন জীবন-ভার বহন করিতে পারিতাম না।"[৬২]

সাহিত্যই যাঁর বাঁচা, সাহিত্যই যাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস—তাঁর এই মর্মস্পর্শী বিবৃতি আমাদের সাহিত্য-সংসারের চেহারাটা স্পষ্ট করে দেয় :

> "পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু কোনদিন ফলের প্রত্যাশা করি নাই। সাধনা নিষ্ফল হইয়াছে, হয় ত ভুল পথে চলিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও দুঃখ নাই। পরিশ্রম করিয়া সকলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সেজন্য আক্ষেপ করিয়া ফল নাই।"[৬৩]

১৯৪৩ সালের ২৭ জুন (১২ আষাঢ় ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) দীনেন্দ্রকুমারের জীবনাবসান হয়।

মৃত্যুর পর স্বগ্রাম মেহেরপুরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 'দীনেন্দ্র কৃষ্টি-সংসদ' স্থাপিত হয়। এই সংসদ একটি পাঠাগারও স্থাপন করে। ব্যাস! তাঁর স্মৃতিরক্ষার অন্য কোনো সংগঠিত উদ্যোগের কথা আমাদের জানা নেই। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন : বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের এক অত্যন্ত দুঃসময়ে দীনেন্দ্রকুমারের মৃত্যু হয়। একদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব আমাদের দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে, অন্যদিকে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা ঘনিয়ে তুলছে বঙ্গদেশের কুখ্যাত আকালকে—এই কঠিন পরিস্থিতি পার হতে না হতে শতাব্দীর চূড়ান্ত আঘাত বাঙালির উপর নেমে আসে, তা' হলো : বঙ্গবিভাগ, দেশবিভাগ। সে-সময়ে জাতীয় জীবনের কোলাহলে দীনেন্দ্রকুমারের নাম একটু চাপা পড়ে থাকতে পারে। যে-পত্রিকার জন্য তিনি জীবনের স্বর্ণসময় ব্যয় করেছিলেন, সেই বসুমতী পত্রিকাও তাঁর স্মৃতিস্মরণে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলেও দীনেন্দ্রকুমারের মৌলিক রচনাবলী বা সংগ্রহ আজও বের হয় নি।

তবু আমাদের কাছে সান্ত্বনা এই যে, দীনেন্দ্রকুমারের অন্তিম আক্ষেপ আক্ষেপই থেকে যায় নি—তাঁর পল্লীরচনার পুনর্মুদ্রণ ও স্মৃতিকথার গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঘটেছে। তবে তা যে সাহিত্যপ্রাণ মানুষটির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিশিষ্ট : এক

বিতর্ক : দীনেন্দ্রকুমার-জলধর

'সেকালের স্মৃতি'তে দীনেন্দ্রকুমার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন-সম্পর্কে বহু কথা লিখেছেন। সেই সমস্ত বিবৃতি বহুলাংশে প্রশংসাবাক্যই। দীনেন্দ্রকুমার জলধরকে 'পূজনীয় মাষ্টারমশায়' বলে উল্লেখ ক'রে জলধরের জীবন-কাহিনীর কিছু মূল্যবান সময়ের ধারাবিবরণ দিয়েছেন। সেই সময়টি জলধরের সাহিত্যিক জীবনের শুরু বলা যায়। আমরা দীনেন্দ্রকুমারের জীবনকথা বলতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমারের সঙ্গে জলধরের যোগাযোগ, একত্রে মহিষাদলে শিক্ষকতা, জলধরের 'হিমালয়'-এর প্রকাশ (ভারতী পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে)— ইত্যাদি নিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছি। 'হিমালয়' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পরে 'সেকালের স্মৃতি'-তে (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) দীনেন্দ্রকুমার দাবি করেন যে, তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থটি জলধরের ডায়েরি অবলম্বন করে তিনিই রচনা করেছিলেন। জলধর এই দাবির উত্তর দেন সঙ্গে সঙ্গে—দীনেন্দ্রকুমার পুনর্বার প্রতিযুক্তি উপস্থাপিত করেন।

১. দীনেন্দ্রকুমারের অভিযোগ

"…কিছুদিন পরে জলধর বাবুর দপ্তর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এক অপূর্ব্ব দ্রব্য আবিষ্কার করিলাম! একখানি বাঁধানো খাতা,…তাঁহার স্বলিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জলধর বাবুর হিমালয়-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পেন্সিলে লেখা—মোটা মোটা অক্ষর। জলধর বাবুর হস্তাক্ষর বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সূক্ষ্ম নহে, বোধ হয়, ডবল ক্রাউন ষোলপেজি আকারের ১০/১৫ পৃষ্ঠায় (ঠিক স্মরণ নেই, কারণ সে ১৮৯১ কি ৯২ খৃষ্টাব্দের কথা—তাহার পর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে) সম্পূর্ণ। সেই ভ্রমণ-কাহিনী আগাগোড়া পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, জলধর বাবু হিমালয়-পর্যটন উপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন ; কতকটা ডায়েরীর ধাঁজে লেখা। বর্ণনায় পরিপাট্য

বা কৌশল আদৌ কোথাও ছিল না। তথাপি তাঁহার সেই 'ভ্রমণ কাহিনী'তে নূতনত্ব থাকায় আমার বড়ই ভালো লাগিল; কিন্তু তাহা এতই সংক্ষিপ্ত ও বাঁধুনি-বর্জ্জিত যে পাঠ করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আগ্রহও মেটে না। এক দিন ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "মাষ্টার মহাশয়, আপনার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কোনও মাসিকে প্রকাশ করিলে হয় না?" মাষ্টার মহাশয় চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন, "ও কি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত? অশান্ত হৃদয় লইয়া যেদিকে দুই চোখ গিয়াছে, সেই দিকে গিয়াছি; যা চোখের সম্মুখে পড়িয়াছে, তাই, যেমন খেয়াল হইয়াছে, সেই ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি। কখনও দেশে ফিরিব, উহা ছাপার হয়ফে প্রকাশ করিব—এরূপ আকাঙ্ক্ষা কোন দিন ছিল না, সে ভাবে লিখিও নাই। কেন উহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া আমাকে সাহিত্য-সমাজে হাস্যাস্পদ করিবেন?"

আমার জিদ বাড়িয়া গেল; আমি বলিলাম, উহা ভারতীতে প্রকাশ করিব। —তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না।…আমি বলিলাম, 'নলচে ও খোল' বদলাইয়া উহা কথ্য ভাষায় লিখিয়া একটা কিস্তী সরলা দেবীকে পাঠাই—দেখি, তিনি কি বলেন।—তাহাই হইল; আমি তাঁহার সেই খাতার লিখিত তিন পৃষ্ঠা অবলম্বনে নিজের কল্পনায় রং চড়াইয়া চল্‌তি 'ভাষায়' পাক্কা এক ফর্ম্মার 'আদি ও অকৃত্রিম' সচল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিলাম।

শ্রীমতী সরলা দেবী তখন ভারতীর প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচিত করিতেন; সম্পাদন-ভার প্রধানতঃ তিনিই তখন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি কাপি প্রস্তুত করিয়া জলধর বাবুকে দেখিতে দিলাম; তিনি তাহা না দেখিয়াই ফেরত দিয়া বলিলেন, "কি ছেলেখেলা আরম্ভ করিলেন? হিমালয় কখন দেখেন নাই; আমার তিন পৃষ্ঠার লেখাটুকু ফেনাইয়া-ফুলাইয়া ষোল পৃষ্ঠা করিলেন; আপনি আশা করিতেছেন, উহা ভারতীতে প্রকাশিত হইবে?"—কিন্তু আমার আশা অপূর্ণ রহিল না, সরলাদেবী আমার হাতের লেখা কাপি পাইয়া অজ্ঞাত লেখক জলধর বাবুর অস্তিত্বে একটু সন্দিহান হইলেন বটে, কিন্তু আমাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি সেই কাপিতে আমার ভাষার প্রকাশভঙ্গি, বিশেষত্ব পরিস্ফুট দেখিলেন; তথাপি আমার কথায় নির্ভর করিয়া জলধর বাবুর নাম দিয়াই তাহা ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর এ সকল কথা এখনও স্মরণ থাকিতে পারে। হয় ত এত দিন পরে আমার এই কবুল জবাব পাঠ করিয়া তিনিও মনে মনে হাসিবেন।

তাহার পর? তাহার পর আর কি! আমার যে কি রকম ভূতোনন্দী খাটুনী আরম্ভ হইল, তাহার পরিচয় আর কি দিব? আমার তখন প্রথম যৌবন, মাতৃভাষার সেবার জন্য অসাধারণ আগ্রহ, লেখাটা প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দ ও উৎসাহ, শক্তির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, সংকল্প হইল—এই উপলক্ষে জলধরবাবুকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব, তিনি আমাকে এত স্নেহ করেন, আমাকে আঁক শিখাইবার জন্য পরিশ্রমও যথেষ্ট করেন, গুরুদক্ষিণাটা এই ভাবেই দিব। তাহার পর ক্রমশঃ সেই ৭০/৭৫ পৃষ্ঠা কপি হইতে হিমালয়ের মত অতবড় কেতাব, কেবল তাঁহার ডায়েরীর অস্থি-কঙ্কালের উপর, আমার ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে আস্মানের কেল্লার মত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল! তাঁহার নামের জন্য, তাঁহার কেতাবখানি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, সাহিত্য-সমাজে পুস্তকখানি যাহাতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে আমি দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। অনেক স্থানেই আমার খেই হারাইয়া যাইত, কখন হিমালয়ে যাই নাই, হিমালয় দেখি নাই, কি লিখিতে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতাম না, মূল কপিতে যেটুকু বর্ণনা পাইতাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ, সামঞ্জস্যবিহীন। কি করি? কি করি? মাথা ঘুরিয়া যাইত, জলধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতাম—তিনি বলিতেন, "যা মনে আসে, লিখে যান, আমার কি তখন মাথার স্থিরতা ছিল যে, খুঁটিনাটি আপনার সকল কথার জবাব দিব?"—তাঁহার নিকট কোনও সাহায্য না পাইয়া আমি এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়িতাম; আমার আরও অধিক দুঃখ এইজন্য হইত যে, আমি অত কষ্ট করিয়া যে কাপি লিখিতাম, তাহা তিনি একবার পড়িয়াও দেখিতেন না, কোনদিন আমার রচনার একটি লেখাও কাটেন নাই; এই অজ্ঞের বর্ণিত কোনও বর্ণনার কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ভ্রম সংশোধন করেন নাই! তথাপি স্বীকার করিব—পুস্তকখানির যদি কিছু গুণ থাকে—তবে তাহা তাঁহারই প্রাপ্য, এবং যত কিছু দোষ, ত্রুটি—সমস্তই এই অধম, একুশ বৎসর বয়সের অপরিণামদর্শী অক্ষম বালক লেখকের। যাহা হউক, জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণের শুভ্র অস্থি-কঙ্কালের উপর এই প্রাসাদ নির্মিত হইল। ভারতীতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল; আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। পাঠক-সমাজ 'হিমালয়' পাঠ করিয়া জলধরবাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; আমার গুরুদক্ষিণা কিন্তু তখনও শেষ হইল না। এক দিন সাহিত্য-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশবাবু বলিলেন, "জলধরবাবুর হিমালয় ত লিখিয়া

দিলেন, আপনার নাম কেহ জানিল না; আপনি কি পরিশ্রম করিলেন, তাহা কেহ বুঝিল না; কিন্তু আপনার রচনাভঙ্গী লেখার বিশেষত্ব, এবং ভাবপ্রকাশের মধ্যে আপনার যে individuality জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, জলধরবাবু কি করিয়া তাহা নিজস্ব বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন?" সুরেশবাবু একথা বলিতেন না; কিন্তু জলধরবাবুর হিমালয়-ভ্রমণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি যখন 'নিবেদনে' সবিনয়-নিবেদন করিলেন, "দীনবন্ধু ডাক্তার, সুহৃদ্বর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উৎসাহে (!) এই পুস্তক প্রকাশিত হইল" —তখন আমার প্রতি জলধরবাবু কিরূপ সুবিচার করিয়াছেন—গ্রন্থকারের 'নিবেদনে' তাহার পরিচয় পাইয়া সেই স্পষ্টবাদী, নির্ভীক, অন্যায়-অসহিষ্ণু, তেজস্বী ব্রাহ্মণ একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবায় এই রকম 'কারচুপি' তিনি অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন। ইহার পর জলধরবাবু মাসিকের কর্ণধারগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বয়ং কলম ধরিয়া কোন কোন মাসিকে হিমালয়-ভ্রমণ-সম্বন্ধে 'ভেজাল-বর্জ্জিত' প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার খাতা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভারতীতে তাঁহার যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার দীর্ঘকাল পরে ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রদীপে' তিনি 'হিমালয়-বক্ষে' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহার পরের মাসের অর্থাৎ আশ্বিনের 'সাহিত্যে' (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৮, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' সুরেশবাবু সেই প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় জলধরবাবুর কথঞ্চিৎ ক্ষুধাশান্তি হইলেও, তাঁহার বুভুক্ষু পাঠকগণের ক্ষুধার সময় উদরে কিছু পড়িল না; সুতরাং পিত্তে গলা তিক্ত হইয়া উঠিল,"—এই ইঙ্গিত নিরর্থক নহে। জলধরবাবুর হিমালয়ের এ পর্য্যন্ত আট-দশটি সংস্করণ হইয়াছে; পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা, সুতরাং এ পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে পনের হাজার টাকার হিমালয় বিক্রয় হইয়াছে। তবে প্রকাশের ব্যয়, বিজ্ঞাপন খরচা, প্রকাশকের কমিশন আছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এই মূল্যবান বৃহৎ গ্রন্থের কোন স্থানে (কেবল 'নিবেদন' ব্যতীত) একটি ছত্রও জলধরবাবুকে স্বয়ং লিখিতে না হইলেও তাহা তিনি কোথাও স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই; কিন্তু লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাঁহার হিমালয়ে বৈরাগ্যসাধন করিতে যাওয়া যে সার্থক হইয়াছিল, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কৃতজ্ঞতার অনুরোধে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য, আমি যখন

কার্য্যোপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম, তখন তিনি আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার গৃহে সযত্নে আশ্রয় দিতেন, আমাকে বাহিরে আহার করিতে দিতেন না, এবং অন্য ভাবেও আমার উপকার করিয়াছিলেন। সে সকল কথা পরে বলিব।

কেবল হিমালয়েই শেষ নহে; তাঁহার 'রচিত' 'প্রবাস-চিত্র' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তখানির বিবিধ প্রবন্ধ সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; হিমালয়ের পর সেই ভারও আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু—এবং জলধরবাবুরও সুহৃদ সুকবি স্বর্গীয় রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর (ভারতীয় ডাক বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর জেনারেল) আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "প্রবাসচিত্রে গ্রন্থকারের নাম দেখিতেছি জলধর সেন। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী, ভাষা, প্রত্যেক লাইন আপনার, হিমালয় যেমন জলধরবাবুর রচনা, এখানিও তাই?"—এই প্রবাস-চিত্রের কতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু বিক্রয়াধিক্যবশতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ 'জলধর গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বিক্রয় হয়। তবে যাঁহারা জলধরবাবুর রচনার সহিত পরিচিত, তাঁহারা 'হিমালয়ে' ও 'প্রবাসচিত্রে' জলধরবাবুর নিজস্ব রস-মাধুর্য্যের ও রচনাচাতুর্য্যের, এমন কি, তাঁহার ভাষার অননুকরণীয় সরলতার পরিচয় না পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। চন্দননগরের সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠকে একদিন এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। একজনের কণ্ঠ হইতে অন্যের বেসুরো কণ্ঠস্বর নিঃসারিত হইলে বিস্মিত হইবারই কথা বটে। 'হিমালয়ে' ও 'প্রবাসচিত্রে' জলধরবাবু যে বহু টাকা পাইয়াছেন, আশা করি তাহাতে আমাকে অঙ্ক শিখাইবার দক্ষিণা পরিশোধ হইয়াছে। আমার একটি রসিক বন্ধু একদিন আমাকে বলিতেছিলেন, "তোমরা কি ছাই লেখ, জলধরবাবুর হাত তোমাদের থেকে অনেক মিঠে, 'হিমালয়' ও 'প্রবাসচিত্র' তিনি নিজে লিখিলে এতদিন ঐ দুইখানি কেতাবের বিশ পঁচিশটা 'এডিসন' বিক্রয় হইয়া যাইত, তুমি তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার এই সুবিধা নষ্ট করিয়াছ; এ জন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। বই কাটিয়াছে তাঁর নামের জোরে। ফুলের সঙ্গে অদৃশ্য কীট দেবতার মাথায় উঠিয়াছে—এ জন্য তোমার অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দাও।"

হয় ত এ কথা সত্য; কিন্তু 'ডেভিল'কে তাহার প্রাপ্য গণ্ডা শোধ করিয়া দিলে কাহারও কোন কথা বলিবার পথ থাকে না। আমার অনভিজ্ঞতাবশতঃ এবং

জলধরবাবুর ঔদাসীন্যে, হিমালয়ের বর্ণনায় যে সকল ত্রুটি, ভ্রম, এবং স্থানীয় চিত্রে যে সকল বিরাট অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা যখন ধরা পড়িল ও আলোচনার বিষয়ীভূত হইল, তখন গ্রন্থকার ত অনায়াসেই বলিতে পারিতেন—ও পুথি ত আমি লিখি নাই ; একটা অর্ব্বাচীন বালক আমার খাতাপত্র হাঁটকাইয়া নিজের ইচ্ছায় যা তা লিখিয়া ও আমার নামে ছাপিয়া আমাকে অপদস্থ করিয়াছে। —কিন্তু সে কথা বলিতে কোনও দিন কি তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল ? যে পুস্তকের আট-দশটা সংস্করণ ছাপা হইল, কোন সংস্করণে তাহার ত্রুটি কি তিনি সংশোধন করিতে পারিতেন না ?—আমি ভূতের ব্যাপার না খাটিলে উহা আদৌ ছাপা হইত কিনা, তাহা তিনি ভালই জানেন।

যাহ, হউক, সে কালের স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিয়া আজ সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বের যে সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম—তাহা পাঠ করিয়া রাজদ্বারে এবং সাহিত্যের দরবারে সম্মানিত 'রায় বাহাদুর' এবং তাঁহার আধুনিক হিতৈষী বন্ধুগণ সম্ভবতঃ অত্যন্ত উষ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং কাজটা ইতরোচিত হইয়াছে বলিয়া হয়ত অভিমত প্রকাশ করিবেন ; কিন্তু আর কয়েক দিন পরে জীবনের যুদ্ধে পরাভূত, স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগে শোকাভিভূত, ইহলোকের প্রান্তোপনীত, কণ্ঠাগতপ্রাণ বৃদ্ধের কণ্ঠ চিরনীরব হইবে ; তখন এ সকল তথ্য যবনিকার অন্তরালে চিরকালের জন্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে—ভাবিয়াই কোন কথা গোপন না করিয়া, স্বল্পাবশিষ্ট জীবনকালের মধ্যে, আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ পুরাতন সকল কথাই লিখিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এইজন্যই অপ্রীতিকর হইলেও এ সকল কথা প্রকাশ করিলাম। কেবল মহিষাদলে কিছুদিন বাস করিবার পরই যে জলধরবাবুর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপও নহে ; কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা একযোগে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলাম। জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ একত্র ভোগ করিয়াছি ; প্রবন্ধান্তরে সে সকল কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।" (সেকালের স্মৃতি : পৃ. ৯৪-৯৭)।

জলধর সেনের চিঠি : 'দুটি কথা'

"বিগত ভাদ্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তাঁহার 'সেকালের স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করে' আমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাকে যে উচ্চ আসন দিয়াছেন, আমি

তার যোগ্য নই, ইহা বিনয় নয়, সত্যিই আমার মনের কথা ইহাকে বন্ধুপ্রীতি-অন্ধতার নিদর্শন বলেই মনে করি।

তিনি 'হিমালয়' পুস্তকখানি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছেন, তারই দু একটি কথায় সামান্য বিবৃতি দেওয়ার জন্যই আমি এই কথা কয়টি বল্‌ছি—ইহা তাঁহার কথার প্রতিবাদ নয়।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রবাবু সত্যই বলেছেন যে, তিনি চেষ্টা, যত্ন, শ্রমস্বীকার ও আগ্রহ প্রকাশ না করলে 'হিমালয়' আমার ডায়েরীতেই চির-সমাধি লাভ করত। তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। আমার ডায়েরীতে প্রতিদিনের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লেখা ছিল। তাই অবলম্বন করে অতবড় বই লেখা অসম্ভব। তার পর দীনেন্দ্রবাবু কখনও হিমালয়ে যান নাই, এমনকি যে সময় বইখানি লেখা হয়, তখন পর্যন্ত তিনি সামান্য পাহাড়পর্ব্বতও দেখেন নাই। এই অবস্থায় তিনি যে ডায়েরীর সামান্য কয় লাইন মাত্র প'ড়ে কেমন ক'রে এত কথা লিখলেন, এটা কি অসম্ভব ব'লে মনে হয় না? তবে সম্ভব হয় তাঁরই পক্ষে, যিনি দিব্যদৃষ্টি বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

আসল কথা, আমি আমার ডায়েরীখানা হাতে নিয়ে স্মৃতির সাহায্যে বলে যেতাম, আর দীনেন্দ্রবাবু লিখে ফেল্‌তেন এবং লিখবার সময় দুই এক স্থানে আমাকে চুপ করতে বলে তিনি তাঁর যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসকে দমন করে রাখতে পারতেন না। এইমাত্র কথা। যিনি কখনও হিমালয়ে যান নি, তিনি সামান্য,—অতিসংক্ষিপ্ত ডায়েরীর উপর নির্ভর ক'রে সেই পথের কথা, নদী-নির্ঝরের কথা, গ্রাম নগরের কথা, চটির বিবরণ প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন করে বর্ণনা করতে পারেন, তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত। আমার পরেও অনেকে হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছেন, অনেক যশস্বী লেখক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেছেন, কিন্তু এতকালের মধ্যে কেহ কখনও আমার কোন কথা, কোন বর্ণনা কোন বিবরণ ভ্রমপূর্ণ বলে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। এতেই বোঝা যায় যে, আমিই আগাগোড়া বলেছি এবং আমার বন্ধু দয়া ক'রে সেসব যথাযথ লিখে গিয়েছেন—স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসগুলি তাঁর নিজস্ব।

তার পর ভাষার কথা। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রবাবু সর্ব্বজন-পরিচিত সুলেখক। তিনি শতাধিক পুস্তক লিখেছেন। কিন্তু তাঁর একখানি পুস্তকেও চল্‌তি ভাষাকে তিনি কোন দিন প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু হিমালয়ের ভাষা একেবারে চল্‌তি ভাষা। এর কারণ এই যে, আমি মুখে মুখে চল্‌তি ভাষায় যেমন করে বলতাম, তাই

তিনি লিখে নিতেন। তাকে আবার সাধুভাষায় পোষাক পরাতে গেলে তাঁকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হতো। তাঁর ছাত্রাবস্থায় এসময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই আমারই চল্‌তি ভাষাই অবলম্বিত হয়েছিল। এসকল কথা এতদিন বল্‌বার প্রয়োজন হয়নি এই জন্য যে, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে দীনেন্দ্রবাবু হিমালয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন এবং তাতেই সব কথা বলেছিলেন। তাই আমি কিছু বলিনি। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, তার জন্য সহস্রবার আমি ক্ষমা চাইছি।

আর একটি কথা। এই ভাবে লিখিত হয়ে 'ভারতী পত্রিকায় প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর ছাপা হয়ে গেল, তখন দীনেন্দ্রবাবু মহিষাদল ত্যাগ করলেন। তখন আর তাঁর লেখনীর সাহায্য আমি পেলাম না, আমাকেই সমস্ত লিখে বইখানি সমাপ্ত করতে হয়েছিল।

এইবার আমার শেষ কথা—সেটি গুরুগিরির কথা। আমি মহিষাদলে গিয়ে শুনলাম, দীনেন্দ্রবাবু তার পূর্ব্ববৎসর এল. এ. পরীক্ষা দিয়ে অন্য সকল বিষয়েই পাশ হয়েছিলেন, ফেল হয়েছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে। আমি যে অঙ্কশাস্ত্রে দিগ্‌গজ, সে স্পর্ধা করছি নে, কিন্তু আমি এই বৃদ্ধ বয়স পযন্ত উচ্চ গণিতের চচা করে আনন্দ পাই। তাই যখন শুনলাম, দীনেন্দ্রবাবু অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা, তখন ঐ বিদ্যাটা শেখাবার ভার আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবুর সে বৎসরের পরীক্ষার ফল যেমন বের হলো, যখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে খুব বেশি নম্বর পেয়ে পাশ হয়েছেন, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর যে-সকল বিষয়ে অনেক নম্বর পেয়েছিলেন, এবার তার দুতিনটিতে ফেল হয়েছিন। এই তো আমার মাষ্টারগিরির বাহাদুরী। আমি যদি ছাত্র হতাম, তাহলে এমন গুরুর দক্ষিণা কি দিতাম, তা না বললেও চলে। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু আমাকে সেই হতে 'মাষ্টার মহাশয় বলে ডাকেন এবং শুধু ডাকা নয় তিনি সত্যসত্যই আমাকে গুরু মনে করে বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকেন। তাঁর সেই অবিচলিত শ্রদ্ধা ভক্তিকেই আমার ন্যায় ওস্তাদ গুরু আশাতীত গুরুদক্ষিণা বলে মনে করে বিশেষ গৌরব অনুভব করে থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়গণ, আমার এই কথা কয়টিকে বন্ধুবর দীনেন্দ্রবাবুর কথার প্রতিবাদ বলে গ্রহণ না করে তাঁর কথার বিবৃতি বলে ধরে নিলেই আমার প্রতি সুবিচার করা হবে। দীনেন্দ্রবাবু আমার কাছে সেই দীনেন্দ্রবাবুই আছেন এবং জীবনান্ত পর্যন্ত থাকবেন, দীনেন্দ্রবাবুকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, এবং এই

শেষ বয়সে আমার পরমাত্মীয় বলে মনে করি।"

দ্বিতীয় পত্র

"আমি ইতঃপর্বে আপনাদিগকে যে পত্র লিখেছি, তাতে 'প্রবাস চিত্র' সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।
সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রবাসচিত্রের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ 'সাহিত্য'-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি আমার স্বহস্ত লিখিত। সেগুলির যা কিছু পরিমার্জ্জন, তা সাহিত্য-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ করেছিলেন। সুরেশ বেঁচে থাকলে সে কথা বলতেন। তিনি পরলোকগত। এখন তাঁর মুখের সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় নেই, কিন্তু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তিনিই আমার এই কথার যাথার্থ্য নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।" (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৪০)।

জলধরের বিবৃতিতে দীনেন্দ্রকুমারের প্রতিক্রিয়া

"পূজনীয় 'মাষ্টার মহাশয়'—জলধরবাবু এই নগণ্য লেখকের কথার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, 'হিমালয়ে' যে উচ্ছ্বাসগুলি আছে, তাহাই মাত্র আমার নিজস্ব! কিন্তু যাঁহারা হিমালয় পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, হিমালয়ের পথের কথা, নদ-নদী, নির্ঝর, চটি প্রভৃতি তাঁহার নিজস্ব কথা ভিন্ন আর যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই উচ্ছ্বাস। ভাবপ্রবণতাই উহার বিশেষত্ব। এই অক্ষম লেখক মুহুরীরূপে তাঁহার মুখের বর্ণনা শুনিয়া লিখিয়া যাইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে 'একটু থামিতে বলিয়া' নিজেই রচনা করিয়া ঠিক একই সুরে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে ভাব ও ভাষাগত সামঞ্জস্য রাখিয়া, (কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংযোগ করিয়া) সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসগুলি লিখিয়া ফেলিতেছে, এরূপ শক্তি, কোন মুহুরী দূরের কথা, কোন লেখকেরই আছে কি? মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং তাহা পারেন?
আমার শুভানুধ্যায়ী ভক্তিভাজন জলধরবাবুর যে প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসচিত্রে' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি অধুনালুপ্ত 'জন্মভূমি' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সকলগুলি সুমার্জ্জিত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় পল্লবিত, ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট করিবার সকল ভার জলধরবাবু এই অধম সাহিত্যসেবকের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি যথাসাধ্য পরিশ্রমে প্রবন্ধগুলি পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিলে, সেই ভাবেই কয়েকটি 'জন্মভূমি'তে ও অবশিষ্টগুলি

'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। জলধরবাবু এই দীর্ঘকাল পরে এ কথা বিস্মৃত হইয়া 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন! জলধরবাবু সাধুভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন,—আমিও স্বল্প লিখি নাই। আমাদের উভয়ের ভাষা, রচনা-প্রণালী (ষ্টাইল), এবং প্রকাশভঙ্গি যাঁহাদের সুপরিচিত—তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমার রচনার ভাষা প্রবাসচিত্রের প্রত্যেক প্রবন্ধে পরিস্ফুট, সুতরাং জলধরবাবুর অন্য কোন পুস্তকের ভাষার সহিত প্রবাসচিত্রের ভাষার সাদৃশ্য নাই। 'সাহিত্যে' প্রকাশের জন্য প্রেরিত কোন প্রবন্ধের ভাষা পরিমার্জ্জিত করিবার প্রয়োজন হইলে সাহিত্য-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অতি যত্নে এই কার্য্যটি স্বয়ং করিতেন, সে ভার তিনি অন্য কোন লেখকের হাতে কখনও ছাড়িয়া দিতেন না—তা যিনি যতই নামজাদা লেখক হউন।

জলধরবাবু 'হিমালয়ে'র রচনাসংক্রান্ত সকল ভার আমার আগ্রহেই আমার হাতে ছাড়িয়া দেওয়ায় উহার ভাষার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি নাই। তাঁহার চোখের জলে, কি আমার বুকের রক্তে এই সৌধের গাঁথুনী হইবে—এ বিষয়ে তিনিও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সেই সময় আমি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'যুরোপ প্রবাসীর পত্র' পাঠ করিতে-ছিলাম, সেই পুস্তকের ভাষার এবং তাঁহার রচিত কবিতাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, যৌবনসুলভ উৎসাহে 'হিমালয়ে' কবিবরের 'পত্রে'র ভাষারই অনুকরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে তাঁহার কবিতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া রচনাটি সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ সকল কথা ত জলধরবাবুর অজ্ঞাত নহে। জলধরবাবু সাধু-ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমিও লিখিয়াছি। কিছুদিন হইতে তিনি চল্‌তি ভাষায় লিখিতেছেন। তিনি চল্‌তি ভাষায় লিখিতে পারেন, সাধু ভাষার অন্য লেখক তাহা পারে না, এরূপ মন্তব্য কি যুক্তিসহ? আমি তাঁহার শ্রেষ্ঠতা কোনও দিন অস্বীকার করি নাই, এবং তাঁহার সাফল্য-গৌরব আমার কঠোর শ্রমের পুরস্কার বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি। আমি তাঁহার জন্য কি করিয়াছি না করিয়াছি, তাহাও তিনি জানেন। এইজন্য তাঁহার উক্তির প্রতিবাদে এ সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিতেছি। তিনি 'দুটি কথা' না লিখিলে আমি আর একটি কথাও লিখিতাম না।

আমি যে সময় মহিষাদলে ছিলাম সে সময় আমাদের মেহেরপুর মহকুমায় পাঁচ-

সাত জনের অধিক উকীল ছিলেন না; বি-এল, উকিল একজনও ছিলেন না। সে সময় অনেকে এল-এ পাশ করিয়া আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইতেন। কাকার ইচ্ছা ছিল, আমি কোন-রকমে এল-এ পাশ করিতে পারিলে আমাকে উকীল বানাইয়া গ্রামে বসাইবেন; আমি 'ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে' থাকিব। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে মহিষাদলে লইয়া গিয়া স্কুলের মাষ্টারদের খাতায় আমার নাম লিখাইয়াছিলেন, এবং আমি গণিতে 'গো-মুখ্খু' ছিলাম বলিয়াই, যদি আমি গণিতে পাশ করিতে পারি, এই আশায় আমার 'আঁক শিখিবার' সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গণিতে উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। পরীক্ষা-ফল প্রকাশের পর যে 'ক্রশ্‌লিষ্ট' আসিয়াছিল, তাহা আমি নিজেই দেখিয়াছিলাম, এবং সাহিত্যসেবার প্রতি অন্ধ অনুরাগের জন্যই গণিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া কাকা অনুযোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে শুনিলাম, সেবার আমি 'আঁকে খুব বেশী নম্বর পেয়ে পাশ' হইয়াছিলাম। এই নবাবিষ্কৃত সংবাদে গৌরবের পরিবর্ত্তে আমি আন্তরিক লজ্জা অনুভব করিতেছি; এবং অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত আজ আমাকে 'অনেক বেশী নম্বর পেয়ে আঁকে পাশ হওয়া'র কথা সত্যবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। আমার অক্ষমতার জন্য আমিই দায়ী; ঐ ভাবে বিদ্রূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা সত্য, তাহাই লিখিয়াছি, কাহারও যশ হরণ করিবার দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। বঙ্গসাহিত্যের আমি অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য লেখক—তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে; তবে চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণেরই বা প্রয়োজন কি? যে সর্ব্বহারা হইয়া মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামের প্রতীক্ষা করিতেছে, সে কোন্ প্রলোভনে ৪২ বৎসর পরে মিথ্যা কথা লিখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরাগভাজন হইবে।" (সেকালের স্মৃতিঃ পৃ. ১০৭-০৮)।

এই বিতর্কের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবু এই বিতর্ক থেকে একটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্য পাওয়া গেল যে, জলধর সেনের দুই বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিমালয়' ও 'প্রবাসচিত্রে'র অভ্যন্তরভাগে দীনেন্দ্রকুমারের হস্ত ও কলমের স্পর্শ আছে। জলধরের 'দুটি কথা' থেকে এও স্পষ্ট হয়েছে যে, দীনেন্দ্রকুমার হিমালয়ের কেবলমাত্র অনুলেখক নন হিমালয়ের অনেক অংশ দীনেন্দ্রকুমারেরই রচনা। সেইমতো প্রবাসচিত্রেও দীনেন্দ্রকুমারের রচনা লগ্ন হয়ে আছে।

সাহিত্য-সংসারে এমন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা অত্যন্ত সুলভ না হলেও একেবারে বিরল নয়।

তিক্ততা, বাদ-প্রতিবাদ — বিচ্ছেদ

এই বিতর্ক থেমে গেল তা' নয়। অচিরেই দেখা গেল 'চতুর্দ্দিক হইতে' দীনেন্দ্রকুমারকে লক্ষ্য করে 'বাক্যবাণ' চলছে। দেখা গেল : এই তর্কে একদিকে জলধরের শিষ্যসামন্ত, সুহৃদবর্গ : অন্যদিকে দীনেন্দ্রকুমার একা—প্রায় সপ্তরথী-বেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। এবং জলধর-দীনেন্দ্রকুমার বিতর্ক চলল দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে। দীনেন্দ্রকুমারের 'সেকালের স্মৃতি'তে উল্লিখিত হিমালয়-সংক্রান্ত তথ্যের প্রতিবাদে কবি নরেন্দ্র দেব দীর্ঘ প্রতিবাদ-নিবন্ধ রচনা করেন (হিমালয়ে'র রচয়িতা, বসুমতী, ১৩৪০ অগ্রহায়ণ)। এতে 'হিমালয়' সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য খণ্ডন করার প্রয়াস পান। দীনেন্দ্রকুমার পরের মাসেই নরেন্দ্র দেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন (বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো, বসুমতী, পৌষ ১৩৪০)। পরের মাসে নরেন্দ্র দেব পুনরায় এই বিতর্কের জন্য দীনেন্দ্রকুমারকে দায়ী করে 'গুরুদক্ষিণা' নামক প্রতিবাদ-নিবন্ধ রচনা করেন (বসুমতী, মাঘ ১৩৪০)। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই বিতর্কের অস্বস্তিটুকু অনুভব করে পত্র' লেখেন বসুমতী পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৪০)।—বিতর্কের প্রথম পর্যায় এইখানেই সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় আবার শুরু হয় সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় জলধরের 'স্মৃতিতর্পণ' প্রকাশিত হতে শুরু করলে (১৩৪২-১৩৪৩)। দীনেন্দ্রকুমার জলধরের 'স্মৃতি-তর্পণে'র প্রতিবাদ করে লেখেন 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্ধনা' বসুমতীর তিনটি সংখ্যায় (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৪৩)। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের এই বিতর্কের অবসান চেয়েছিলেন জলধর স্বয়ং 'আমার স্মৃতিতর্পণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা'য় (বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৩)। ততদিনে এক শয্যায় শয়নকারী বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে যায় জলধর-দীনেন্দ্রকুমারের মধ্যে।

একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, জলধর-দীনেন্দ্রবিরোধ নিছকই সাহিত্য-বিতর্ক নয়—তা' ব্যক্তিগত জীবনের সীমা ও অভ্যন্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এবং এই বিরোধের জন্য যতটা এঁরা দু'জন দায়ী তার থেকে সম্ভবত অনেক বেশি দায়ী পার্ষদরা। জীবৎকালে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের দিক থেকে, সরকারী-স্বীকৃতির

দিক দিয়ে জলধর হয়তো অধিক পেয়েছিলেন (রায় বাহাদুর উপাধি-প্রাপ্তিসহ), আর বঞ্চনা কুরে খেয়েছিল দীনেন্দ্রকুমারের ভেতর পর্যন্ত। অনেক শাঠ্য-কপটতার অলিখিত ইতিহাস বুকে নিয়ে হয়তো দীনেন্দ্রকুমার চেয়েছিলেন বিচারের বাণীর স্বীকৃতি, পাননি—তাই তিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্মৃতির জগৎ। তাই জলধর কেবল উপলক্ষ মাত্র। জলধরের সম্পর্কিত মানুষেরা [যেমন : জলধরের বৈবাহিক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। জলধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়কুমারের সঙ্গে অমূল্যচরণের কনিষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ হয়] সাহিত্য-সংসারের এই কর্মী-মানুষের মনে রোপন করে দিয়েছিল কাঁটা-গাছ, যা দুই সাহিত্যবন্ধুকে জীবনের শেষ পর্বে বিচ্ছিন্ন করেছিল পারস্পরিক হার্দ্য-উষ্ণতার সম্পর্ক থেকে। এমন-কি স্ত্রীর মৃত্যুবেদনাও দীনেন্দ্রকুমারের কাছে মর্মান্তিকতর হয়ে দেখা দিয়েছিল সাহিত্য সমাজের কারও কারও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্যই :

"জলধরবাবু ভাগ্যবান পুরুষ সন্দেহ নাই। একালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে সকল বন্ধুলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুরক্ত, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, দরদী 'দাদার ভাই'!

পরিশিষ্ট : দুই

দীনেন্দ্রকুমার ও লোকসংস্কৃতি চর্চা

দীনেন্দ্রকুমারের জীবনের সৃজনের স্বর্ণকালে লোকসংস্কৃতি অকাদেমিক বা জ্ঞান-চর্চার বিষয় হিসেবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত আসন লাভ করেনি, জনজীবনের তৃণমূলে বহমান সংস্কৃতি হিসেবে কেবলমাত্র তা শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মাত্র। বস্তুতপক্ষে দেশের শিকড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার নানা-আয়োজন, যা একটি পরাধীন জাতির জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আমাদের গ্রাম্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতির দিকে শিক্ষিত সমাজের আকর্ষণ ছিল এই দৃষ্টি ফেরাবার প্রচেষ্টার সঙ্গে লগ্ন।

> "...যাঁদের গবেষণার টেন্‌ডেন্‌সি আছে, তাঁরা হয়তো এতে একাধিক থিসিসের—সমাজনীতির, অর্থনীতির, নৃতত্ত্বের, ফোকলোরের—রসদ পাবেন।" (সুকুমার সেন : সেকালের কিছু সমাজচিত্র, 'পল্লীচিত্র', আনন্দ সংস্করণ আশ্বিন ১৩৯০-এর অগ্রে যুক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধ)।

—সুকুমার সেনের এই মন্তব্যটি স্মিত হলেও অতিমাত্রায় সত্য। আলাদাভাবে সংস্কৃতির চর্চা দীনেন্দ্রকুমার করেন নি, কিন্তু তাঁর রচনায় 'ফোকলোরের রসদ'

সুপ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। বস্তুতপক্ষে, দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় ভূগোল-হিসেবে যে অঞ্চলটি সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে—সেই মধ্যবঙ্গের, জেলা হিসেবে অবিভক্ত বা স্বাধীনতাপূর্ব নদীয়ার লোকসাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে লোকসংস্কৃতির সকল অঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। বলতে কোনো দ্বিধা নেই : নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতির অদ্যাবধি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আকর তাঁর রচনাসমূহই।

তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির যে-সমস্ত অঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হলো : পালা-পার্বণ, ছড়া, প্রবাদ, মেলা, লোক-উৎসব, লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবীর পরিচয়, যাত্রা-লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, ব্রতকথা-লোকশ্রুতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ভাষার লোকতত্ত্ব ইত্যাদি। এখানে সামগ্রিক আলোচনার সুযোগ না থাকায় এ-নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবনাস্বরূপ সামান্য-অংশ উপস্থাপিত করতে পারি।

ক.

আমরা আগেই বলেছি যে, দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনায় বারো মাসে তেরো পার্বণের পরিচয় আছে, আছে লোকউৎসবের পরিচয়। পালা পার্বণ বা লোকোৎসবের ছবি আঁকতে গিয়ে জনজীবনের সামগ্রিক ছবি গল্পাকারে ফুটিয়ে তুললেও পার্বণ বা উৎসবটির আদত পরিচয়টুকু দিতে কখনও ভোলেন নি তিনি।

বঙ্গদেশে ভগবতী যাত্রা হলো গোয়াল পূজা। এই লৌকিক পূজাটি সম্ভবত আমাদের পশুচারণ-নির্ভর অতীতের কথা কিংবা আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনে প্রাণীজ-সম্পদের ভূমিকার স্মৃতিকে স্মরণ-পথে নিয়ে আসে। কেবলমাত্র বাঙালি সমাজে নয়, সাঁওতাল বা আদিবাসী সমাজেও গোয়াল পূজার প্রচলন আছে। শুধু জেলা বা সমাজভেদে এই পার্বণের নাম বদলে যায়। দীনেন্দ্রকুমার পল্লীচিত্র গ্রন্থে ভগবতী যাত্রার গোটা দিনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে দিয়ে পার্বণটির মূল পরিচয়, তার আচরণগতদিকের অতিসংক্ষিপ্ত অথচ সংহত বিবরণ দিয়েছেন :

> "বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে আজ ভগবতী-যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। গোয়াল-ঘরে 'ভগবতী-পূজা' হইবে, তাই গোয়াল হইতে আজ সকাল সকাল গরু বাহির করিয়া গৃহিণীরা সযত্নে সেই ঘরখানি 'নিকাইয়া' রাখিয়াছেন। স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহারা পূজার যোগাড় করিতে লাগিলেন।" (ভগবতী যাত্রা/পল্লীচিত্র)।

কিংবা—এই লৌকিক পার্বণের আচারগত দিক :

> "বিধবা গৃহিণীগণ আহ্নিকপূজা শেষ করিয়া…ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া গোয়াল-ঘরে 'দুধ-উংলাইতে' চলিলেন। আজ এ অঞ্চলের প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতেই গোয়াল-ঘরে 'দুধ উংলাইবার একটা নিয়ম আছে। গোশালায় একটা ছোট অস্থায়ী উনান খুঁড়িয়া গৃহকর্ত্রী তাহার উপর একটা নূতন মালসাতে কিছু দুধ রাখিয়া তাহাতে এক মুঠা আতপ চাউল এবং কয়েকখানি গুড়ে বাতাসা ফেলিয়া বাঁশের 'চেঁচালি' বা 'পাকাটী' দিয়া জ্বাল দিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুগ্ধ ও চাউল পরিপক্ক হইয়া 'পায়েসে' রূপান্তরিত হইল। ইহাকেই 'দুধ উৎলানো' বলে। পায়েস প্রস্তুত হইলে, একখানি 'আখট্ কলাপাতের অগ্রভাগে তাহার কিয়দংশ ঢালিয়া উনানের কাছে পুঁতিয়া, অবশিষ্ট পায়েস লইয়া গৃহিণী গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। ·
>
> আজ ভগবতী যাত্রা বলিয়া গৃহস্থের বাড়ীর রাখালেরা সিন্দুর ও বাঁশের 'চোঙ্গা' ভরিয়া তেল লইয়া গরুর শিং-এ মাখাইয়া, গরু লইয়া নদীতে স্নান করাইতে চলিয়া গেল।" (তদেব)।

'দশহরা গঙ্গাপূজা' চিত্রে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্বভাবসুলভ দক্ষতায় জনজীবনের ছবির মাঝে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে দশহরা গঙ্গাপূজার রীতি-আচার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা পাঠকের কাছে পেশ করেছেন :

> "কাল দশহরা গঙ্গাপূজা, দশহরার জন্য দশ রকম ফল সংগ্রহ করিতে হয়।" কিংবা "কেলেকোঁড়া এক রকম কণ্টকময় লতার ফল, দেখিতে অনেকটা কাঁচা সুপারির মতন, কোন প্রয়োজনে লাগে কি না জানি না, কিন্তু 'মেয়ে-পাঁচালি' মতে এই ফল দশহরা উপলক্ষে সংগৃহীত দশ রকম ফলের মধ্যে একটি অপরিহার্য ফল—এই ফলে মনসাদেবী বিশেষ প্রীতি-লাভ করেন। 'কেলেকোঁড়া'র শিকড় নাকি সর্প-বিষের মহৌষধ।" পুনশ্চ : "নদীতীরে অনেকখানি স্থান পরিষ্কার করিয়া একটা সামিয়ানা ও 'নীলের চাদরে'র নীচে ঘট স্থাপন করিয়া দেবীর পূজার আয়োজন হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া গঙ্গাপূজার নিয়ম নাই, কোন কোন স্থানে ভাগীরথামুসারিণী মকরবাহিনী মূর্তি বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা হয়,…"

যেহেতু, পুঁথিপড়া বা চেষ্টাকৃত জ্ঞানার্জনের ফসল নয়, সেহেতু দীনেন্দ্রকুমারের

লেখায় এ-জাতীয় লোকসংস্কৃতির উপাদানের উপস্থিতি, ও তার ব্যবহার অকাদেমিক জগতের তথাকথিত ডিসিপ্লিনের চাপে পীড়িত নয়। তথাকথিত শৃঙ্খলায় এগুলি বিন্যস্তও নয়। ফলে একটি উপাদানের সঙ্গে অন্য উপাদানের দূরত্বও বেশি নয়। এ-কারণে ভগবতী-যাত্রা চিত্রে স্নান শেষে গ্রাম্য মহিলাদের গৃহে-প্রত্যাবর্তনের পথে ষষ্ঠী ঠাকুরুণের স্থানেও তাদের পূজা-ভক্তি নিবেদনের সূত্রে পাঠক-হিসেবে আমাদের পরিচয় ঘটে এই লৌকিক দেবীর সঙ্গে :

> "ক্রমে তাহারা ধীরে ধীরে ষষ্ঠীতলায় আসিয়া তেলমাখা বাটিতে করিয়া অল্প অল্প জল তিনবার অশ্বত্থমূলে ঢালিয়া দিতেছে এবং তাহার গুঁড়িতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিবার পর ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিতেছে।"

ঠিক একইভাবে দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীবিষয়ক রচনায় দেখা দেন মনসা, দেবী লক্ষ্মী কিংবা কৃষ্ণ। এঁদের সকলেই যে লৌকিক দেব-দেবী—তা নন। অথচ, শাস্ত্র বা পুরাণোক্ত দেব-দেবীরাও দীনেন্দ্রকুমারের হাতে লৌকিক অনুষঙ্গে ভূষিত হন। এমন-কি দুর্গা, কালী কিংবা দেবী সরস্বতী পর্যন্ত দীনেন্দ্রকুমারের রচনার গুণে শাস্ত্র-পুরাণকে অতিক্রম করে জনজীবনের ধর্মাচরণের সহজরসে আপাদমস্তক সিক্ত হয়ে উঠেছেন। শ্রীপঞ্চমীর শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণের ঠিক পরেই দেখা যাচ্ছে ছেলের দল 'কুল-সল্‌পো' নিয়ে মেতে উঠেছে এবং দীনেন্দ্রকুমার তুচ্ছ 'কুল-সল্‌পো'র বর্ণনা দিচ্ছেন বালকদলের রসসিক্ত রসনার মতোই সরস করে :

"পুরোহিত চলিয়া গেলে ছেলেরা জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। সরস্বতীর খাতিরে যাহারা এত দিন কুল খাইতে পায় নাই, তাহারা খুব ঘটা করিয়া কুল খাইতে লাগিল।……'কুল-সল্‌পো' জিনিসটাও একালে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে, ……[পল্লীবালকেরা] পাড়া হইতে খুঁজিয়া 'সল্‌পো' পাতা লইয়া আসিল, কুলগুলি ছেঁচিয়া…পাথরের বাটিতে রাখিল, তাহার পর তাহাতে তেল, নুন, মরিচ ও সল্‌পো পাতা মিশাইয়া গামছা বা বস্ত্রখণ্ডে ঐ পাত্র আচ্ছাদন করিয়া তাহা ক্রমাগত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে সমস্বরে বলিতে লাগিল,—

কুল-সল্‌পো হ'লো,
ধোপা মাগী ম'লো,
ধোপা মাগীর কাঁধে ঘা
তেল নুন দিয়ে চেটে খা।" (শ্রীপঞ্চমী / পল্লীবৈচিত্র্য)

খ.

দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় লোককাহিনী, ব্রতকথা এবং লোকশ্রুতি সংগ্রহের পরিমাণ কম নয়। মনে রাখা প্রয়োজন তিনি লোকশ্রুতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলম ধরেন নি, পল্লীচিত্র অঙ্কনের জন্য কলম ধরেছিলেন, অথচ তাঁর রচনায় নদীয়া জেলা, বিশেষভাবে মেহেরপুর অঞ্চলে প্রচলিত লোককথাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন : 'মনসা পুজার কথা', 'ষষ্ঠীর ব্রতকথা' ইত্যাদি। এই সমস্ত লোককথা তিনি লিখেছেন বিস্তারিতভাবেই। দীনেন্দ্রকুমার কর্তৃক ব্রতকথার অবতারণা ও বর্ণনার উপভোগ্যতার সামান্য নিদর্শন আমরা হাজির করতে পারি। ষষ্ঠীর ব্রতকথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

" পল্লীরমণীগণের এখনও আহার হয় নাই, ষষ্ঠীর কথা না শুনিয়া কাহারও জল-গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা সাহস নাই, ষষ্ঠীদেবীর শাপে পড়িয়া সেকালের মণ্ডল গিন্নীর মতো অবস্থা হইতে কতক্ষণ! বিশেষত, শীতলা ষষ্ঠীর মিষ্ট কথা ও-পাড়ার মুক্তা মাসী যেমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারেন, এমন সকলের মুখে শুনায় না। তাই রমণীগণ মুক্তা মাসীর আগমনপ্রত্যাশায় তৃষিত চাতকীর ন্যায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এত বেলা পযন্ত পুত্রবতা রমণীগণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে লইয়া অভুক্ত আছেন,—এজন্য গিন্নীরা মুক্তা মাসার উপর ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; বিশেষতঃ, যে সকল গিন্নীর নিকট মুক্তা মাসী কোনও প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের তজন-গর্জনের সীমা রহিল না।

ইতিমধ্যে মাসীমা হাস্যোজ্জ্বল মুখে সমাগত হইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়া কর্ত্রী মুখ ভারি করিয়া বলিলেন, "হাঁ মা মুক্তো, তোমার আক্কেলখানা কেমন বাছা, একটু সকালে ক'রে কি কথা শুনতে আসা হয় না? দেখ দেখি, কাঁচা পোয়াতীরা সব উপোষ পাড়ছে, আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!"·· মুক্তা মাসী তাঁহার মাতামহীর নিকট হইতে শীতলা-ষষ্ঠীর দুর্লভ কথা কিরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং এই পুণ্যকথা বিবৃত করিয়া পাড়ায় তাঁহার কিরূপ সম্মান, তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন :

"এক গাঁয়ে ছিল এক ঘর গেরস্ত। বুড়ো গেরস্তর বুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়োবুড়ী বড় লক্ষ্মীমন্ত ছিল। ······" ইত্যাদি।

দীনেন্দ্রকুমার সম্পূর্ণ লোককথাটি বলিয়ে নিয়েছেন মুক্তা মাসীর মুখ দিয়ে। দীনেন্দ্রকুমার বর্ণিত লোকউৎসবের মধ্যে আছে : পোষলা, নবান্ন, নন্দোৎসব, পৌষ-সংক্রান্তি ইত্যাদি। এ শুধু উৎসবের বিবরণ মাত্র নয়, দীনেন্দ্রকুমার এই

সুযোগে এই সমস্ত উৎসব ঘিরে গ্রামীণ মানুষের ছোটখাট আচার-আচরণ পর্যন্ত তুলে এনেছেন। একে আমরা 'কেয়ার অব কংক্রিট ডিটেইল' বলে অভিহিত করতে পারি।

গ.

দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় আমরা পাই অবিভক্ত নদীয়া জেলার লোকসঙ্গীতের নানান নিদর্শন ও উপাদান, পাই লোকনাট্য, ছড়া ইত্যাদিও। এগুলি সংগ্রহ হিসেবে আসেনি, এসেছে নানা প্রসঙ্গে, স্বতস্ফূর্তভাবে এবং প্রাসঙ্গিক স্থানে। বুনোদের বিবাহের লোকাচার বর্ণনা করে এই ছড়াটি তিনি উল্লেখ করেছেন : "বুনোদের বিবাহে একটি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে ;—বিবাহ শেষ হইলে বরটি ধীরে ধীরে একখানি কুটীরের চালের উপর উঠিয়া বসে, আর তাহার বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে আহ্বানপূর্বক অনুনয়ের সহিত বলিতে থাকে—

"চালের থেকে নামো তুমি,
ঘুঁটে কুড়িয়ে পুষবো আমি।" (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া / পল্লীবৈচিত্র্য)।

প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক দীনেন্দ্রকুমার-উল্লিখিত কিছু ছড়া আমরা এখানে সংকলিত করতে পারি :

১. "হরিবোল হরিবোল,
সোনা রায়ের ভার এল বাড়ীর ভিতর
বল ভাই শিবো,
এক কাঠা চাল ন'টা বিড়ি নিবো॥"

[পৌষ-সংক্রান্তির দিন গোয়ালা-কৈবর্ত-জেলে-বাগ্দী প্রভৃতি শ্রমজীবীদের ছেলেরা দলবেঁধে ভিক্ষা করে, ভিক্ষালব্ধ চাল দিয়ে বনভোজন করে। গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে এই ছড়াটি উচ্চারণ করে থাকে। (পৌষসংক্রান্তি / পল্লীবৈচিত্র্য)]

২. "যে দেবে ছালা ছালা,
তার হ'বে সাত গোলা।
যে দেবে কাঠা কাঠা,
তার হ'বে সাত বেটা।
যে দেবে বাটী বাটী,
তার হবে সাত বেটী।

যে দেবে মুঠো মুঠো,
তার হবে হাত টুঁটো।"

[পৌষ-সংক্রান্তির সখের-ভিক্ষুকদের ভিক্ষা চাওয়ার ছড়া। (তদেব)]।

৩. "উননে পিঠে ফোলে,
'কাণ্টা'য় শিয়াল ফোলে।"

[এই ছড়াটির সঙ্গে পৌষ-সংক্রান্তির অপর একটি লোকাচার যুক্ত। পৌষ-সংক্রান্তির দিন মুচি পিঠে তৈরি করে একটি আস্ত পিঠে শিয়ালকে দিয়ে তারপর অন্য সকলের খাওয়ার রীতি আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। যখন উননে পিঠে তৈরি করেন গৃহিণীরা তখন ছোটরা এই ছড়াটি বলে থাকে। (তদেব)।]

৪. "এসো পৌষ, যেও না,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না,
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না.
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ, যেও না,
পৌষ মাস, লক্ষ্মী মাস, যেও না।"

[পৌষ-সংক্রান্তির শেষ রাতে পল্লীরমণীরা চালগুঁড়োর উপর গোবরের নুড়ি বসিয়ে এই ছড়াটি বলে থাকেন। পৌষকে বিদায় না দেওয়ার এই ইচ্ছার সঙ্গে ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিণীব পৌষমাসকে ধরে বাখার কামনাই ব্যক্ত হয়েছে—ছড়ার এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও হাজির করতে ভোলেন নি দীনেন্দ্রকুমার (তদেব)]।

৫. "চড়ক চড়ক ড্যাড্যাং ড্যাং,
পাবদা মাছের ভুটো ঠ্যাং।"

[চড়কের সন্ন্যাসীদের দেখে গ্রাম্য বালকগণের ছড়া (চড়ক / পল্লীবৈচিত্র্য)] ।

৬. "ভূত আমার পুত শাঁখ্‌নী আমার ঝি,—
মাছ পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছি করবি আমার কি ?"

["আমাদেব সহপাঠী দৈঁতোর কিছুমাত্র ভূতের ভয় ছিল না। দৈঁতোর মা আমাদের মধ্যে ভূত-প্রেতের মন্ত্র···প্রভৃতি মন্ত্রের 'অথরিটী' ছিল, সে ভূত-পেত্‌নীর আক্রমণ নিবারণের জন্য দৈঁতোকে 'মাদুলী' দিয়াছিল।"—উপরোক্ত ছড়াটি বঙ্গদেশে সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু পাঠভেদ আছে। দৈঁতোর মুখে দীনেন্দ্রকুমার ছড়াটিকে এইভাবে বসিয়েছেন! (সেকালের পাঠশালা / পল্লীচিত্র)]।

৭. "তেলও মাখি নে মচ্ছিও খাই নে, ধর্মে দিয়েছি মন,

তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি ছি বিন্দাবন।"

[গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ভণ্ড-তপস্বীর উদ্দেশে বর্ষিত ব্যঙ্গাত্মক ছড়া। (তদেব)]।

৮. গুরুমশায়, গুরুমশায়, তোমার পোড়ো উড়ে যায়!
বাঁশ-বাগানে বিয়েবাড়ী বেগুন পোড়া খায়।"

[পাঠশালা-পলাতক ছাত্রকে নিয়ে গ্রাম্য বালকদের ছড়া। (তদেব)]।

৯. "এলোচুলে বেনে-বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়,
কলসী কাঁকে নোলক নাকে জল আন্‌তে যায়।"

[প্রসিদ্ধ গ্রাম্য ছড়া (পল্লীচিত্র / দশহরা গঙ্গাপূজা)]।

১০. ক. "কচুর পাতায় নল,
জোরে মার চল।"

[বৃষ্টির আগমন-সম্ভাবনায় হর্ষাকুল ছেলেমেয়েদের বৃষ্টির আগমন-সূচক ছড়া। (তদেব)]।

১০. খ. "কচুর পাতায় করমচা,
এই মেঘখান উড়ে যা।"

[বৃষ্টি না আসার কামনায় ছেলেমেয়ের ছড়া। আগের ছড়াটির উত্তর বলা যায়। (তদেব)]।

কত ধরনের লোক-সঙ্গীতের সূত্রই না দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় আছে। সেকালে গ্রাম-গঞ্জে ঢপ-কীর্তনের প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা কী পরিমাণে ছিল—তা দীনেন্দ্রকুমারের রচনা পাঠে সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত দীনেন্দ্রকুমার দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সেকালে গ্রামের যে-কোনো উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ঢপ-কীর্তন, কবিগান ও টপ্পা। ঢপ-কীর্তনকে বিশুদ্ধ লোকগীতির মধ্যে না ধরলেও তাঁর রচনায় রাখালী, বাউল, সারি, বোলান, মনসা ভাসানের গান (ঝাঁপান ?) সহ বহু ধরনের লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

প্রসঙ্গসহ তার কিছু পরিচয় নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করতে পারি :

১. বাউল গান :

ক. "ও! একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার ঘরের কাছে আরসি নগর—
তাতে এক পড়শী বসত করে।
পড়শী যদি আমার হ'ত,
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে!

মরি হায় রে—

আবার, সে আর লালন এক স্থানে রয়,

তবু লক্ষ যোজন দূরে রে ॥" (পল্লীবৈচিত্র্য/দোলযাত্রা)।

খ. "এস্থা এক রসিক পাগোল, বাধালে গোল,

লঙ্কার মাঝে দেখ্‌সে তোরা !

পাগোলের সঙ্গে যাব, পাগোল হবো,

হেরবো রসের নব গোরা।"

গ. "বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে

শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চলে।" (পল্লীবৈচিত্র্য / নবান্ন)।

[দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউল গান। এছাড়াও কাঙাল হরিনাথের বাউল গানের অংশ-বিশেষও দীনেন্দ্রকুমার ব্যবহার করেছেন]।

২. মুর্শিদা গান :

"আপন দেল-কেতাবসে ঢুঁড়ে লে।

মুরসিদ্ আমার কোন্‌খানে বিরাজে রে ॥

(মুরসিদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে !)

ঘরখানি বান্ধো বান্দা, দুয়ারখানি ছান্দো,

আপনি মরিয়ে যাবা, মিছে পরের লাইগ্যা কান্দো রে !

আঠারো মোকামের মধ্যে জলে হায় সরে রে,

তিল-পেরমান জায়গা বান্দা আঠারো সজ্জা পড়ে রে !

আমার খোদার দোস্ত মহম্মদ নবি,

কোন্‌খানে নেমদজ করে রে !

আস্‌মান জোড়া ফকীর রে ভাই ! জমীন জোড়া কাঁথা,

এ সব ফকীর ম'লে পরে তার কবর হবে কোথা রে !

মুরসিদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে !"

৩. মাণিকপীরের গান :

"ওরে ও কবির ঘোষ ! চিনতে না পারিলে মাণিকপীর ?

খড়ম পায়ে নড়ি হাতে স্তাওড়া ফকীর,

গোয়ালার 'বাথানে' এসে প্রথম জাহির !

'দই দুধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে,

আনিয়া হাজির কর পীরের দরবারে।'

কবির ঘোষ দই দুধ নাহি আনি দিল,

নওয়া লক্ষি ধেনু তার বাথানে পড়িল।"

৪. রাখালী গান : মেঠোসুরের গান :

ক. "গোয়ালার ছেলেরা…পাঁচনখানা পাশে পড়িয়া আছে, আর সে মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও জীবনসংগ্রামের ঘোর কোলাহলের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া স্বরচিত রাগিণীতে মেঠোসুরে বাগান প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়িতেছে,—

"ওরে রামশশী যদি কাঁঠাল খাবি

বিচিগুলো রাখিস যতন ক'রে।"…

আর একজন রাখাল…সে-ও গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"সুমৃষ্ট ফল খাও রে কৃষ্ণ, আমি এনেছি-ই-ই ;

ও-এ ফল মৃষ্ট লাগবে বলে' এ-এ-এ—" (পল্লীচিত্র / ভগবতী যাত্রা)

খ. "হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,

ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী ;

বাজারে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুরে বশ করি',

তিষ্ঠ মম হৃদি-গোষ্ঠে কৃষ্ণ, মম এই মিনতি।"

গ্রাম্য পালাগান মনসা ভাসান, রামযাত্রা ইত্যাদির বিস্তারিত ও সাঙ্গপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার। বর্ণনা দিয়েছেন ছায়াবাজীর পুতুল নাচের। সেই বর্ণনা পাঠ করলে লোকনাট্যের বৈচিত্র্যময় জগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও মমত্ব বোঝা যায়। এমনকি লোকনৃত্যের বর্ণনাও তিনি করেছেন যত্নের সঙ্গে। চড়কের সময় গাজন সন্ন্যাসীদের নৃত্যের দৃশ্য দীনেন্দ্রকুমারের কলমে :

"বস্ত্রালঙ্কার পরিহিত পুষ্পদাম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূন্যে বাহুদ্বয় তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া আরও অধিক উৎসাহের সহিত নাচিতেছে ; এবং হুংকার দিয়া বলিতেছে "বলো শিবো মহাদেব দেব।"……

অনেকক্ষণ নৃত্য প্রদর্শনের পর ভিন্ন ভিন্ন দল স্ব স্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসিয়া নবোৎসাহে নৃত্য আরম্ভ করিল।"

গাজনের সঙ, ময়ূরপঙ্খীর সঙ, কিংবা সারি গানের প্রসঙ্গ-আলোচনায়ও দীনেন্দ্রকুমার সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

ঘ.

লোকসংস্কৃতি চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রীড়ামূলক লোকসংস্কৃতির কথা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় ক্রীড়ামূলক লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ

ভাণ্ডার আছে। তাঁর কালে প্রচলিত বা প্রায় বিলুপ্ত ও এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত গ্রাম্য ক্রীড়াকে তিনি পল্লী-বিষয়ক রচনায় প্রসঙ্গান্তর্গত করেছেন। তাঁর লেখায় কয়েকটি গ্রাম্য-ক্রীড়া হলো :

১. হাডু-ডুডু

"একদিন আমাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় সবুজ ঘাসের উপর আট দশ জনে মিলিয়া 'হাডু-ডুডু' খেলিতেছি; আমাদের দলের দু'জন খেলোয়াড় মরিয়া বসিয়া আছে…।" (পল্লীচিত্র / সেকালের পাঠশালা)।

২. ডিম-পাড়াপাড়ি

এক ধরনের জলক্রীড়া। এই খেলা বর্ষাকালে নদীর ঘোলা জলে বেশি জমে উঠত। চার-পাঁচজন ছেলে হাত ধরাধরি করে জলে ঘিরে দাঁড়াত এবং একজন পানা-শ্যাওলা ইত্যাদি ডুব সাঁতার দিয়ে সেই ঘেরা জলের মাঝখানে সকলের অলক্ষে রেখে যেতো ; একে বলত বাসা করা।…"ক্রমে ডিম পাড়া, ডিমে তা' দেওয়া ডিম ফুটান ছানাকে খাবার দেওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে সেই বালকটি অন্যের অদৃশ্যভাবেই ডুব দিয়া এই বন্ধনীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিল। অবশেষে ছানা উডাইয়া লইয়া যাইবার সময় আসিল।…বলিষ্ঠ বালকটি দূর হইতে এক ডুবে ইহাদের ভুজ বন্ধনের মধ্যে আসিয়া ভাসমান শৈবালগুলি মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া সমস্ত জল আন্দোলনপূর্বক দূরে পলায়ন করিল। 'ছা উড়িয়া নিয়ে গেল রে' বলিয়া অন্যান্য ছেলেরা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহাব পশ্চাদ্ধাবন করিল।…"। এই জলক্রীড়াটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এই বিবরণ লোকক্রীড়াটির পরিচয়কে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

৩. কাদাখেঁড়

নন্দোৎসবের সময় অনুষ্ঠিত ক্রীড়া। গোয়ালারা নন্দোৎসবের সময় বাঁক কাঁধে নৃত্য করত। বাঁকের একদিকে হাঁড়িতে দই, অন্যদিকে হাঁড়িতে রঙিন জল নিয়ে গোয়ালারা নৃত্য করার সময় "হঠাৎ এক দুষ্ট বালক হর্ষোন্মত্ত গোপনন্দনের পিঠে জোরে ধাক্কা দিল, পিচ্ছিল মৃত্তিকার উপর দামু ঘোষ সটান চিৎপাত। হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দই ও রঙ্গীন জল কর্দমের সঙ্গে মিশিয়া গেল ; তখন সকলে সেই কাদার উপর পড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণপূর্বক উন্মত্তের ন্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল! যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, আজ তাহাদেরও অব্যাহতি নাই, যাহাকে ধরিতে পারিল, তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া ইহারা দলভুক্ত করিয়া লইল! কর্দমের উপর এই অপূর্ব উৎসবের নাম কাদাখেঁড়।"—উৎসবের অঙ্গীভূত হলেও

এ আসলে কর্দম-ক্রীড়া।

৪. অন্যান্য গ্রাম্য-ক্রীড়া

লুকোচুরি, চাম্‌চ, দাণ্ডাগুলি ইত্যাদি খেলারও প্রাসঙ্গিক বর্ণনা দিয়েছেন দীনেন্দ্রকুমার। গ্রাম্য ক্রীড়াগুলির পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন এবং ক্রীড়ামূলক শব্দাবলীও আমরা জানতে পারি তাঁর রচনা থেকে।

৬.

লৌকিক ধর্ম-সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার জাগ্রত কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছেন। নদীয়া জেলার সুবিখ্যাত ধর্মসম্প্রদায় বলরামী সম্প্রদায় এবং এই ধর্মের প্রবর্তক বলরাম হাড়ী সম্পর্কে প্রচলিত লোকশ্রুতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন তিনিই। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে বলরামী সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। দীনেন্দ্রকুমার এই সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা-রচনায় আলোকপাত করে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন উত্তরকালের কাছে।

সমাজের অত্যন্ত অন্ত্যজ শ্রেণী হাড়ীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বলরাম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মেহেরপুরে বলরামের আখড়া ছিল। সমগ্র বঙ্গদেশে বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা কম ছিল না। বলরামের শিষ্যরা 'দরবেশ' বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। মেহেরপুরে ভৈরব নদের তীরে বলরাম দরবেশের আখড়ার কথা লিখেছেন দীনেন্দ্রকুমার। এই লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা জাতপাত মানেন না। হৃদয়ের সহজ সাধনাই এঁদের ধর্মের প্রধান কথা। গানে গানে এঁদের ভজনা-আরাধনা। 'বলরামের দোল' এই সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব। এই সম্প্রদায় সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার 'সেকালের স্মৃতি' ছাড়াও 'বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, পৃ. ৬৬), 'বলরামের দোল' (বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ ৮৪৫) ইত্যাকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হই : যে-সম্প্রদায় মূলত নিম্নবর্ণের মানুষদের লৌকিক ধর্মে আশ্রয়দান করেছিল—যেখানে "মেহেরপুরের উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকেরা বলরামকে 'প্রতারক', 'বুজরুক', 'ভণ্ড' প্রভৃতি শব্দে অলংকৃত" করেছিলেন এবং ভদ্রলোকেরা সমকালে এই ধর্মকে ছোটলোকের কাণ্ড বলে সমালোচনা বা উপেক্ষা করতেন, মেহেরপুর মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী এদের খোঁজ রাখতেন না,—সেখানে দীনেন্দ্রকুমার এই সম্প্রদায় সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। যখন লোক-সংস্কৃতির আলোচনার সূত্রপাতমাত্র হয়েছিল তখন দীনেন্দ্রকুমার যে সচেতনতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই।

চ.

দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় লোকসংস্কৃতির আরও কয়েকটি অঙ্গের পরিচয় আছে :

১. লোকবিশ্বাস

"পল্লী অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দিন 'কাচ-কাক' দেখিবার জন্য মাঠে যাইবার একটা রীতি আছে। এটা রাজপুত-জাতির আহেরিয়ার মত। আহেরিয়ার দিন বরাহ শিকার করিতে পারিলে রাজপুতেরা যেমন তাহাদের সমস্ত বৎসরের শুভ কল্পনা করে, সেইরূপ পল্লীবালকগণ, এমন কি, বৃদ্ধেরা পর্যন্ত এই দিন 'কাচ-কাক' দেখিলে সংবৎসর শুভদায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।' (শ্রীপঞ্চমী)।

কালীপূজার আগের দিন চৌদ্দ শাকভক্ষণ, কার্তিক পূজায় উপবাসের পারণ ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের ছবিও অঙ্কন করেছেন দীনেন্দ্রকুমার যত্নের সঙ্গে।

২. গ্রাম্যমেলা

দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় বহু গ্রাম্যমেলার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনায় মেলাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, শ্রুতি ও স্মৃতি দারুণভাবে বাস্তব রূপ-পরিগ্রহ করেছে। যেমন: রথযাত্রার মেলা, উত্তরায়ণ মেলা, স্নানযাত্রার মেলা, 'দেপাডার মেলা' (ভারতী ও বালক, ১২৯৭, আষাঢ়, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) ইত্যাদি। উত্তরায়ণ মেলার অধিষ্ঠাতা দেবতা কৃষ্ণরায়ের লোকশ্রুতি বিষয়ে দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন:

"কৃষ্ণরায় কত দিনের প্রতিমা, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। শুনা যায়, পূর্বকালে এই অঞ্চলের একজন লোক নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার ফলে সে নারায়ণের প্রস্তরমূর্তি মাটির নীচে প্রোথিত আছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পায়, কৃষ্ণরায় এখন ঠাকুরাণীহীন ;..."

প্রসঙ্গত দীনেন্দ্রকুমার ঠাকুরাণী-(লক্ষ্মীদেবীর) অন্তর্ধানের পেছনের কাহিনীও শোনাতে ভোলেন নি। আর মেলার বর্ণনা? সে-তো দ্রুতধাবমান ও উপভোগ্য চলচ্ছবির সঙ্গেই তুল্য।

৩. দীনেন্দ্ররচনায় বহির্বঙ্গের লোকজীবন

কেবলমাত্র বঙ্গদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় ইতিহাসই যে দীনেন্দ্রকুমারের কাছে ঋণী তা' নয়, বহির্বঙ্গের লোকজীবনের ছবি ও লোকসংস্কৃতির একটি অবয়বমূলক চিত্রও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। অরবিন্দ ঘোষের বাঙলা ভাষার শিক্ষকরূপে দু'বছর বরোদায় অবস্থান তাঁর জীবনে যতদিক থেকে ফলপ্রসূ হয়েছিল তার একটি লোকজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ ও তাকে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ:

ভারতীয় লোকজীবনের জাদুবিশ্বাসের কথা আমরা সবাই জানি। দীনেন্দ্রকুমার

বঙ্গদেশের লোকজীবনে যেমন বহুধরনের তন্ত্র-মন্ত্র, জাদুবিশ্বাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি 'গুজরাটে ভূত ছাড়ানো' প্রবন্ধেও সেই লোকবিশ্বাসকে লক্ষ্য করেছিলেন দেশের আরেক প্রান্তে (ভারতী, মাঘ ১৩০৬, পৃ. ৪০৫)।

ছ:

লোকসংস্কৃতি চচার উদ্দেশ্যে কখনই দীনেন্দ্রকুমার কলম ধরেন নি। তিনি নিজ জন্মস্থান মেহেরপুর ও মেহেরপুর সংলগ্ন অঞ্চলের চিত্রাঙ্কন করতে চেয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র অপেক্ষা তার দেখা প্রতিবেশ অঙ্কনে তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমকালে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় যাঁবা বঙ্গপল্লার উৎসব-অনুষ্ঠান নিয়ে নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ। কিন্তু এঁদের রচনায় উৎসব-অনুষ্ঠানের চিত্র শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দ্বারা, উদ্ধৃতির দ্বারা সমর্থিত। ফলে তাতে বাঙালির পূজা-পার্বণেব পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি আমবা যতটা বুঝতে পারি লৌকিক জীবনে তার প্রভাব কিংবা লোকচার, লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সেগুলি কতটাই জড়িয়ে আছে তাব যথার্থ পরিচয় আমবা পাই না।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'চড়ক উৎসব' শীর্ষক নিবন্ধে বাণ রাজার পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করে কলকাতাব চড়ক উৎসব সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

"চড়ক বৌদ্ধ-পর্ব্ব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু চড়কের কোন বৌদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না।"

আর 'চড়ক-সংক্রান্তি' রচনায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন :

"আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে, সৃষ্টির মধ্যে পুরাতন কিছু নাই।…[নূতন-পুরাতন নিয়ে দীর্ঘ ব্যাখ্যা] কাল কি ছিল, আজ কি হইল, আগামী কল্যই বা কি হইবে, এই চিন্তার মালা মানুষের মনে অহরহ ঘুরিতেছে। একবার মালা ঘুরান শেষ হইলে, একটা বর্ষ শেষ হইল মনে করিতে হয়।…

দেখ দেখ, ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ চড়ক-দণ্ডের চক্রের উপরে দড়ি বাঁধিয়া কত লোকে ঘুরিতেছে। দে-পাক, দে-পাক, কেবল পাক দিতেছে, আর পাক খাইতেছে।'

এই রচনাদুটিতে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, আছে দর্শনের আবহ। অপর-দিকে দীনেন্দ্রকুমারের 'চড়ক' রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে :

"চৈত্রমাস বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিস্থল। এ সময়ে পল্লীজীবনে নব আনন্দের হিল্লোল

বহে। গম, ছোলা, যব, অড়হর প্রভৃতি রবিশস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকালের অনাহারে শীর্ণদেহ, ক্ষুধাতুর কৃষক পরিবারে যে হর্ষের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুদীর্ঘ হিমযামিনীর অবসানে বসন্তের মলয়ানিলের মতই সুখাবহ।...

প্রত্যেক গ্রামে গাজনের তিন-চারটি দল থাকে। প্রত্যেক দলে একজন দলপতি থাকে, তাহাকে 'মূল সন্ন্যাসী' বলে। মূল সন্ন্যাসী হইতে হইলে জাত্যাংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া যে একান্তই আবশ্যক, তাহা নহে।..."

'চডক'-নিবন্ধে শুধু নয় সর্বত্রই দীনেন্দ্রকুমার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক প্রথা, জীবনযাপনের সমাজবিজ্ঞানগত দিকসমূহকে হার্দ্য অনুভবের দিক দিয়ে মিলিয়েছেন—সে কারণেই তাঁর দেওয়া বাঙালির পালা পার্বণের চিত্র শাস্ত্র-ব্যাখ্যা নয়, লৌকিক জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহের অঙ্গ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় 'স্নানযাত্রা' নিবন্ধে লিখেছিলেন :

"আজ স্নানযাত্রা। কাহার স্নান? আনন্দময় আপ্তকাম নির্গুণ পুরুষের আবার স্নান কিরূপে সম্ভবে? মানুষের এত বড স্পর্ধা যে যিনি ভূমা, যিনি অনন্ত, তাঁহাকে কিনা স্নান করাইয়া তুষ্ট করিতে চায়!..."

—এই দার্শনিক ভাষ্যের পাশাপাশি 'স্নানযাত্রার মেলা' (পল্লীচিত্র) রচনাটি পাঠ করলেই তফাৎ বোঝা যাবে।

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তো শ্রীশ্রী৺শিবচতুর্দ্দশী রচনায় ঈশান সংহিতা, কূর্ম্ম-পুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি থেকে অবিরল সংস্কৃত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার দ্বারা শিব-চতুর্দশী তিথির শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করেছেন। এমন-কি 'নবান্ন' নিবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব সচেতনভাবে 'সমাজ-বিজ্ঞানের গূঢ়' তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন :

"...নবান্ন তত্ত্বটি কি, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব, আর সেই সঙ্গে অনুধাবন করিব হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যটি।

আদিম ঊষা হইতে হিন্দু জাতি যজ্ঞ-পরায়ণ। যজ্ঞ কি?—যজ্ঞ ত্যাগ, দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ।...

নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়-স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবাসীকে বিলাই, কেন?...বিরাট্ত্বে ব্রহ্মত্বে আমার চরম পরিণতি। আমার অনুভূতিও বিরাট হওয়া চাই। তাই ঐ অন্নদানের ব্যাপকতা। আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা। ইহাই নবান্ন-তত্ত্ব।"—দীনেন্দ্রকুমারের

'নবান্ন' (পল্লীবৈচিত্র্য) রচনায় এই বিরাটত্বের পরিচয় তত্ত্বাকারে নেই আছে বর্ণনায়। নবান্নের দিনে হাস্য-কালোচ্ছ্বাসমুখর পল্লীজীবনের চিত্রে।

বস্তুতপক্ষে, যাকে আমরা 'লোক' বলি, দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় সর্বত্র সেই লোকে'-র উপস্থিতি তার সাধারণতম জীবন নিয়েই। সুতরাং সজীব লৌকিক জীবনও আছে তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। এ-কথা ঠিকই যে, সাধারণ বাঙালিজীবনের প্রতি মমত্বই তাঁর রচনাকে লোকসংস্কৃতির উপাদানগত আকরে পরিণত করেছে, তথাপি তার এই প্রবাদপ্রতিম মমত্ব লোকজীবনে সর্বত্রগামী হয়নি। বুনো আদিবাসীদের মাদলসহ সঙ্গীতকে কখনও-সখনও তাঁর কাছে বিকট কলরব বলে মনে হয়েছে :

"মাদল বাজাইয়া যখন তখন ইহারা অন্যের দুর্বোধ্য বিচিত্র সুরে গান গাহিয়া স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ গ্রামে একটা বিকট কলরবের স্রোত প্রবাহিত করে।'

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া / পল্লীবৈচিত্র্য)।

এ-সত্ত্বেও লোকজীবনের চিত্রঅঙ্কনে এবং লোকসংস্কৃতির উপাদান-ব্যবহারে দীনেন্দ্রকুমারের কৃতিত্ব অমেয়ই থেকে যায়। ঘুমপাড়ানী ছড়া ("খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কি ? / আমার শিকের উপর গমের রুটী, তবলা ভরা ঘি !") থেকে ছোটদের মুখের ছড়া ("বুলবুলি মোর কাকা / কুল ফেলে দে পাকা" অথবা "তোরা দেখ্‌বি যদি আয় রে চলে / ব্যাঙের মাথায় পিদীম জ্বলে।" কিংবা বালিকার মুখে "আলো রে ঝালো রে আঁধার ঘরে বাতি নড়ে, / যে আমার খোকনকে খোঁড়ে, যেন তার মুখখানা পোড়ে।"), পটশিল্প থেকে শুরু করে ডাকের সাজ, বাউল গান থেকে শুরু করে পল্লার গণিকার কণ্ঠের গান ("তামাক খেয়ে গেলে না বঁধু হে !, কত দুঃখ মনে যে বল, / ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে, / তেঁতুল পাতা শুকালো। / মরা গাঙে কুমার ভাসে, শুকায় সুঁদীর ফুল, / এই ভরা বয়সে হলেম বাঁড়ী, বঁধু ! যৌবনে ফুটলো ফুল, / ও পরাণবঁধু—বঁধু হে !"), রামযাত্রা থেকে ছায়াবাজীর পুতুল নাচ—সব কিছু তার রচনায় আমরা পেয়ে যাই—যা অতি ব্যবহারে জীর্ণ নয়, অহেতুক বিশ্লেষণের দ্বারা শিথিল নয়, উদ্ধত জ্ঞানের ভারে খর্বও নয়—যা অতি নির্মল ও জীবন্ত।

> "আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। আমার দেশ বলতে অতীতকাল বাদ যায় না। আমি আমার দেশের অতীতকে ভালোবাসি ভালো বলে নয়—কেননা তা মোটেই সব ভালো ছিল না—অতীত বলেই, আমার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের চরণধূলির জন্যে। অতীতের প্রতি যাঁর দৃষ্টি আমার মতো, তাঁর বইটি ভালো লাগবেই।"

—লিখেছেন সুকুমার সেন পল্লীচিত্র সম্পর্কে। লোকসংস্কৃতির যা কিছু দীনেন্দ্রকুমারের আলোচনায় প্রসঙ্গভুক্ত—হ্যাঁ—তা তাঁর দেশকে ভালোবাসারই আরেক রূপ, সে রূপ স্বতন্ত্র এবং চিত্তাকর্ষক।

প ল্লী ব ধূ স ম্প র্কে

দীনেন্দ্রকুমারের 'পল্লীবধূ' উপন্যাসের মধ্যেও পল্লীজীবনের নানান জীবন্ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিত্র আছে। 'পল্লীবধূ' প্রকৃতপক্ষে পল্লীকথা-গ্রন্থে সংকলিত 'পরিত্যক্তা' গল্প-চিত্রেরই বিস্তৃতরূপ। দু-একটি চরিত্রের নাম বদলানো ছাড়া রচনা-দুটিতে গল্প-কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হয় নি। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিব উপন্যাসটির একটি সংস্করণ করেছিল, প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন মনোজ বসু।

সূ ত্র প রি চ য়

১. সেকালের স্মৃতি, প্রথম সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩৯৫, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৬।
২. তদেব, পৃ. ৪১।
৩. তদেব, পৃ. ৪১।
৪. তদেব, পৃ. ১৭।
৫. বারিদবরণ ঘোষ : দীনেন্দ্রকুমার রায় : জীবন ও সাধনা, পল্লীবৈচিত্র্য, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯।
৬. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৬৯।
৭. তদেব, পৃ. ৭৩।
৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৮১), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৯. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৮১।
১০. তদেব, পৃ. ১০৪।
১১. তদেব, পৃ. ৮৬।
১১ক. "কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত "বিজয়বসন্ত" ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস। তন্মধ্যে বিজয়বসন্ত তৎকাল-প্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালাতে লিখিত।" (শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম (বি)

সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯০, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃ. ১০৪)।—অবশ্য এই গ্রন্থেরই ২০৮ পৃষ্ঠায় শিবনাথ শাস্ত্রী বিজয়বসন্তকে সেকেলে আখ্যা দিয়েছেন।

১২. কাঙালের স্মৃতিচর্চা (প্র), সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০, পৃ. ১৯৪।

১৩. শতঞ্জীব রাহা : ব্রাত্য বুদ্ধিজীবী হরিনাথ মজুমদার (পাণ্ডুলিপি)।

১৪. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৮০।

১৫. দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী, দুঃখ-সঙ্গিনী' (প্র)।

১৬. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৭৯-৮০।

১৭. তদেব, পৃ. ৯১।

১৮. তদেব, পৃ. ৯২।

১৯. স্বর্ণকুমারী ১২৯১-১৩০১, ১৩১৫-১৩২১ পর্যন্ত ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

২০. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৯২-৯৬।

২১. তদেব, পৃ. ৯৩।

২২. ভারতী ১২৯৯।

২২ক. দীনেন্দ্রকুমার রায় : কবি রজনীকান্ত, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২০, পৃ. ৮৭৫। সেকালের স্মৃতিতেও কবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

২৩. তদেব, পৃ. ৮৭৯।

২৪. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ১১২।

এ-প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার আরও লিখেছেন : "...১৩০২ সালে আমার সর্বপ্রথম গল্প 'বাসন্তী' প্রেসে পাঠাইবার ইচ্ছা হইলে হরকুমারবাবু অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা তমোঘ্ন প্রেসে মুদ্রিত করিতে পারি। 'বাসন্তী' রামপুর বোয়ালিয়ার তমোঘ্ন প্রেসেই ছাপা হইল। হরকুমারবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার রোপিত সাহিত্য তরুর প্রথম ফল আমার ভালই লাগিয়াছিল। আর একটি কারণে আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল। হরকুমারবাবুর পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র যদুবাবু (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সার যদুনাথ সরকার) তখনকার কালের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক মি. এন. ঘোষের সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান নেশানে' বাসন্তীর

যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজে নেশানের তখন অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।...” (সেকালের স্মৃতি, পৃ. ১৪৫)।

২৫. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ১৩৮।

২৫ক. কবি রজনীকান্ত (প্রাগুক্ত),, পৃ. ৮৭৯।

২৬. ভারতী, মাঘ ১২৯৯, পৃ. ৫৯৩-৯৮।

২৬ক. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ২১।

২৬খ. তদেব, পৃ. ২৭।

২৬গ. তদেব, পৃ. ৫৪।

২৬ঘ. কবি রজনীকান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮২।

২৬ঙ. আমার বাল্যকথা, তৃতীয় বৈতানিক সংস্করণ ১৯৮৩, পৃ. ৮১।

২৬চ. রাজনারায়ণ বসু: আত্মচরিত, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬১। পৃ. ৭৪।

২৬ছ. জীবনের ঝরাপাতা, দ্বিতীয় রূপা সংস্করণ—১৯৮২, পৃ. ৫।

২৬জ. চতুষ্কোণ, শারদীয় ১৩৭০।

২৬ঝ. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ১১৫।

২৬ঞ. কাঙালের স্মৃতিচর্চা, সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০, পৃ. ১৯৬।

২৭. বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, পৃ. ১৫১-৫২।

“নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—দীনেন্দ্রকুমার রায়॥ জগতে গৌরব লাভ করিতে যাঁহারা সমর্থ হন, তাঁহাদের শত্রুও থাকে, মিত্রও থাকে। নেপোলিয়ানের জীবন-চরিত শত্রুতেও লিখিয়াছে, মিত্রতেও লিখিয়াছে। মিত্রের লেখা জীবনচরিতই ভাল হয়।...যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে জীবনচরিত রচিত হইতে পারে না। জীবনচরিত কেবল ভক্তেই লিখিতে পারে।

আব্‌ট সাহেব শুধু ভক্ত নহেন, তিনি অন্ধ উপাসক। নেপোলিয়ানের যে কার্য কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, তাহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন ... দীনেন্দ্রকুমার বাবু অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। পুস্তকের যাহা কিছু দোষ, তাহা আব্‌ট সাহেবের দীনেন্দ্রবাবুর নহে।.. ভুল...দুই একটা থাকিলেও এ-পুস্তকের মোটের উপর প্রশংসা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, ইহা সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। —শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়”।

২৮. সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০০, পৃ. ৮৩৫।

—ঐ—চৈত্র ১৩০০, পৃ. ৯২৯।

২৯. ভারতী, পৌষ ১২৯৬, পৃ. ৫৩২।
৩০. রাজনৈতিক সংবাদ, ভারতী, আশ্বিন ১২৯৬, পৃ. ৩৩৯।
৩১. তদেব, পৃ. ৩৪২।
৩২. রাজনৈতিক সংবাদ, ভারতী, পৌষ ১২৯৬, পৃ. ৫২৮।
৩৩. তদেব, পৃ. ৫২৫।
৩৪. রাজনৈতিক সংবাদ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ. ৪৫২।
৩৫. —ঐ—, পৌষ ১২৯৬, পৃ. ৫২৮।
৩৬. —ঐ—, আশ্বিন ১২৯৬, পৃ. ৩৪৪।
৩৭. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৬৫।
৩৮. তদেব, পৃ. ১৬৬।
৩৯. তদেব, পৃ. ১০৩।
৪০. দীনেন্দ্রকুমার রায় : মৃতের পুনর্জীবন (উপন্যাস), গ্রন্থকারের 'নিবেদন', ফাল্গুন ১৩২৭, রহস্যলহরী কার্যালয়, মেহেরপুর।
৪১. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ১১০।
৪২. তদেব, পৃ. ১২০-২৮।
৪৩. তদেব, পৃ. ৭৭-৭৮।
৪৪. সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ. ৩৫৩।
৪৫. বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ১০৬।
৪৬. বঙ্গবাণী : পুস্তক পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, পৃ. ৪৭৪।
৪৭. বারিদবরণ ঘোষ : দীনেন্দ্রকুমার রায় : জীবন ও সাধনা, আনন্দ সংস্করণ পল্লীবৈচিত্র্যের আগে সংযোজিত নিবন্ধ।
৪৭ক. রহস্যলহরী সিরিজের ২১৮ সংখ্যক গ্রন্থটির প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৫৯ (দীনেন্দ্রকুমারের মৃত্যু : আষাঢ় ১৩৫০), নাম : দস্যু-কাহিনী, রহস্যলহরী পাবলিশিং হাউস, রানাঘাট, নদীয়া থেকে দীপেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম. ১·৫০ টাকা। এতে আছে তিনটি কাহিনী : নারীদস্যু সোনিয়া সার্লিং-এর আত্ম-কাহিনী, বিখ্যাত ফরাসী দস্যু লজাক এবং আঙুল-কাটা মহাবীর।
৪৮. বারিদবরণ ঘোষ : প্রাগুক্ত নিবন্ধ।
৪৯. রহস্যলহরী সিরিজের ২৯নং গ্রন্থ 'দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা', আশ্বিন ১৩২৫, প্রকাশকের নিবেদন-অংশ।

৫০. রহস্যলহরী সিরিজের ১৯নং গ্রন্থ 'রোজার ঘাড়ে ভূত', অগ্রহায়ণ ১৩২৩, নিবেদন-অংশ।

৫১. রহস্যলহরী সিরিজের ২১নং গ্রন্থ 'মার্কিন বণিক-রাজ', মাঘ ১৩২৩, নিবেদন অংশ।

৫২. রহস্যলহরী সিরিজের ৪২নং গ্রন্থ।

৫৩. রহস্যলহরী সিরিজের ৩৮নং গ্রন্থ 'শোণিত তৃষা', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, গ্রন্থপরিচয়-অংশ।

৫৪. রহস্যলহরী সিরিজের ১৯নং গ্রন্থ, নিবেদন অংশ।

৫৫. ডাক্তারের ভরাডুবি, শ্রাবণ ১৩৬৪।

৫৫ক. সম্পাদক (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি): ভাদ্র ১৩১৮, পৃ. ৪১১-১২।

৫৫খ. তদেব, পৃ. ৪১২।

৫৫গ. তদেব, পৃ. ৪১৪।

৫৫ঘ. প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪০।

৫৫ঙ সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, (৪ খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ ৪২।

৫৫চ. চিত্র-বিচিত্র, মজুমদার লাইব্রেরী, কলকাতা॥ এ-জাতীয় আরও কিছু রচনা: যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত: রতন, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ. ৫৭। রায় মহাশয়, ঐ, চৈত্র ১৩২৫, পৃ. ১২১। বেহারচিত্র॥ শৈলবালা ঘোষজায়া: ননী খানসামার ছুটিযাপন, ঐ, আশ্বিন ১৩২৩, পৃ. ১৫৩॥ অমিয়ভূষণ বসু: পূজার ছবি, ঐ, কার্তিক ১৩২৪, পৃ. ২৬২॥ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ: সেকালের পল্লীচিত্র, ঐ, ফাল্গুন ১৩২৮, পৃ. ১৬, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ২৩৩, ৩১৫, ৪৪৩॥ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: মধুয়া, মানসী, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ. ২৮৬। হরিদাস, মানসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ. ৫৮৩॥ ইত্যাদি।

৫৬. বারিদবরণ ঘোষ: প্রাগুক্ত রচনা।

৫৭. সুকুমার সেন: প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩।

৫৮. বারিদবরণ ঘোষ: প্রাগুক্ত রচনা।

৫৯. 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র ভূমিকা।

৬০. আরব্যরজনী (দীনেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত), বসুমতী রস-উপন্যাস সিরিজ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৪২, ভূমিকা।

৬১. সেকালের স্মৃতি, পৃ. ৯৯।

৬২. তদেব, পৃ. ১৩৫।

৬৩. তদেব, পৃ. ১৩৫।